আমি পদ্মজা - ১

_____

ফাহিমা ক্লান্ত হয়ে ধপ করে ফ্লোরে বসে পড়ল। হাত থেকে লাঠি পড়ে গিয়ে মৃদু আওয়াজ তুলে। তার শরীর ঘেমে একাকার। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম হাতের তালু দিয়ে মুছে, বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। এরপর চোখ তুলে সামনে তাকাল। রিমান্ডে কোনো পুরুষই টিকতে পারে না,সেখানে একটি মেয়ে আজ চার দিন ধরে রিমান্ডে। তাঁর সামনে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছে। চার দিনে একবারও মুখ দিয়ে টু শব্দটি করল না। শারিরীক, মানসিক কত নির্যাতন করা হয়েছে তবুও ব্যথায় আর্তনাদ অবধি করেনি! মনে হচ্ছে, একটা পাথরকে পিটানো হচ্ছে। যে পাথরের রক্ত ঝড়ে কিন্তু জবান খুলে না। তখন সেখানে আগমন ঘটে ইন্সপেক্টর তুষারের। তুষারকে দেখে ফাহিমা কাতর স্বরে বলল, 'সম্ভব না আর। কিছুতেই কথা বলছে না।'
তুষার অভিজ্ঞ চোখে মেয়েটিকে দুয়েক সেকেন্ড দেখল।এরপর গম্ভীর কণ্ঠে ফাহিমাকে বলল, 'আপনি যান।'

ফাহিমা এলোমেলো পা ফেলে চলে যায়। তুষার একটা চেয়ার নিয়ে মেয়েটির সামনে বসল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'আপনার সাথে আজ আমার প্রথম দেখা।'

মেয়েটি কিছু বলল না। তাকালও না। তুষা মেয়েটির দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে তাকাল। বলল,'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মেয়েটি চোখ তুলে তাকায়। ঘোলাটে চোখ। কাটা ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। চোখের চারপাশ গাঢ় কালো। চোখ দু'টি লাল। মুখের এমন রং রিমান্ডে আসা সব আসামীর হয়। তুষার মুখের প্রকাশভঙ্গী আগের অবস্থানে রেখেই আবারও প্রশ্ন করল, 'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ায়। মনে পড়ে তার! তুষার একটু ঝুঁকে। মেয়েটি অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকায়। তুষার মেয়েটির হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'নাম কী?'

যদিও তুষার মেয়েটির নাম সহ পুরো ডিটেইলস জানে।তবুও জিজ্ঞাসা করল। তার মনে হচ্ছে,মেয়েটি কথা বলবে। সত্যি তাই হলো। মেয়েটি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারণ করল, 'পদ্ম...আমি...আমি পদ্মজা।'

পদ্মজা হেলে পড়ে তুষারের উপর। তুষার দ্রুত ধরে ফেলল। উঁচু কণ্ঠে ফাহিমাকে ডাকল,'মিস ফাহিমা। দ্রুত এদিকে আসুন।'
ফাহিমা সহ আরো দুজন দ্রুত পায়ে ছুটে আসে।

_____

১৯৮৯ সাল। সকাল সকাল রশিদ ঘটকের আগমনে হেমলতা ভীষণ বিরক্ত হোন। তিনি বার বার পইপই করে বলেছেন, 'পদ্মর বিয়ে আমি এখুনি দেব না। পদ্মকে অনেক পড়াবো।' তবুও রশিদউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে, সপ্তাহে একেক পাত্রের খোঁজ নিয়ে আসবেন। মেয়ের বয়স আর কতই হলো? মাত্র ষোল। শামসুল আলমের মেয়ের বিয়ে হয়েছে চব্বিশ বছর বয়সে। পদ্মর বিয়েও তখনি হবে। পদ্মর পছন্দমতো। হেমলতা রশিদকে দেখেও না দেখার ভান ধরলেন। রশিদ এক দলা থুথু ফেললেন উঠানে। এরপর হেমলতার উদ্দেশ্যে বললেন, 'বুঝছো পদ্মর মা,এইবার যে পাত্র আনছি,এক্কেরে খাঁটি হীরা।'
হেমলতা বিরক্তভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি আমার মেয়ের জন্য পাত্র চাইনি। তবুও বার বার কেন আসেন আপনি?'
'যুবতী মাইয়া ঘরে রাহন ভালা না।'
'মেয়েটা তো আমার। আমাকেই বুঝতে দেন না।' হেমলতার কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ছে।

রশিদ অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারলেন না।ব্যর্থ থমথমে মুখ নিয়ে সড়কে পা রাখেন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো পাত্রপক্ষ এসে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলবে, 'মোর্শেদের বড় ছেড়িডারে চাই।'

রশিদ নিজে নিজে বিড়বিড় করে আওড়ান, 'গেরামে কি আর ছেড়ি নাই? একটা ছেড়িরেই ক্যান সবার চোক্ষে পড়তে হইব? চাইলেই কি সব পাওন যায়?'

পূর্ণা স্কুল জামা পরে পদ্মজাকে ডাকল, 'আপা? এই আপা? স্কুলে যাবি না? আপারে..."
পদ্মজা পিটপিট করে চোখ খুলে কোনোমতে বলল, 'না।' পর পরই চোখ বুজে ঘুমে তলিয়ে গেল। পূর্ণা নিরাশ হয়ে মায়ের রুমে আসে।

'আম্মা,আপা কী স্কুলে যাইব না?'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

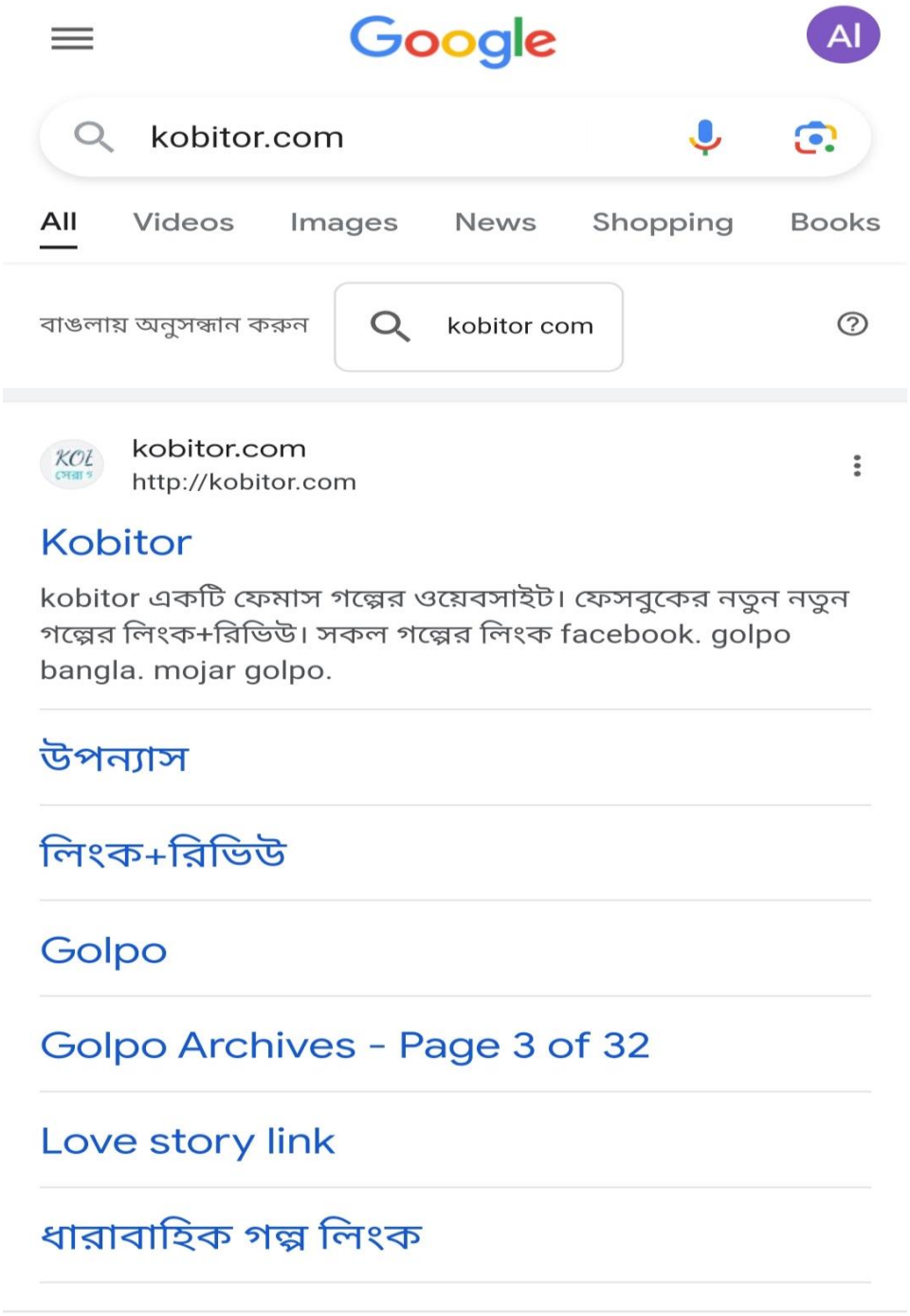

হেমলতা বিছানা ঝাড়া রেখে পূর্ণার দিকে কড়াচোখে তাকান। রাগী স্বরে বললেন, 'যাইব কি? যাবে বলবি।'

পূর্ণা মাথা নত করে ফেলল। হেমলতার কড়া আদেশ, মেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছি অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার জন্য নয়। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে। পূর্ণাকে মাথা নত করতে দেখে হেমলতা তৃপ্তি পান। তার মেয়েগুলো মান্যতা চিনে খুব। খুবই অনুগত। তিনি বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'পদ্মর শরীর ভালো না। সারারাত পেটে ব্যাথায় কাঁদছে। থাকুক,ঘুমাক।'

পূর্ণার কিশোরী মন বুঝে যায়,পদ্মজা কীসের ব্যাথায় কেঁদেছিল। সে রাতে নানাবাড়ি ছিল বলে জানতো না।ভোরেই চলে এসেছে। নানাবাড়ি হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে। পূর্ণাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা বললেন, 'তুই যা। মাথা নীচু করে যাবি মাথা নীচু করে আসবি।'
'আচ্ছা,আম্মা।'

পূর্ণা রুমে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এরপর গত মাসে মেলা থেকে আনা লাল লিপস্টিক গাঢ় করে ঠোঁটে মাখে। চৌদ্দ বছরের পূর্ণার ইদানীং খুব সাজতে ইচ্ছে করে। হেমলতা সেজেগুজে স্কুলে যাওয়া পছন্দ করেন না বলে,পূর্ণা আগে লিপস্টিক মাখেনি।

_____

টিন দেয়ালের কাঠের ঘড়ির কাঁটায় সকাল দশটা বাজল মাত্র। এখনো পদ্মজা উঠল না। হেমলতা মেয়েদের রুমে ঢুকেন। পদ্মজা দু'হাত ভাঁজ করে ঘুমাচ্ছে। জানালার পর্দা ভেদ করে আসা আলতো পেলব রোদ্দুরের স্পর্শে পদ্মজার মসৃণ, পাতলা ঠোঁট, ফর্সা ত্বক চিকচিক করছে। হেমলতা বিসমিল্লাহ বলে,তিনবার ফুঁ দেন মেয়ের শরীরে। গুরুজনরা বলেন, মায়ের নজর লাগে বেশি। নজর কাটাতে বিসমিল্লাহ বলে ফুঁ দিতে হয়। হেমলতার মায়া লাগছে পদ্মজার ঘুম ভাঙ্গাতে। তবুও আদুরে গলায় ডাকলেন, 'পদ্ম। এই পদ্ম...'

পদ্মজা চোখ খুলে মাকে দেখে দ্রুত উঠে বসে। যেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় সেদিনই হেমলতা ডেকে তুলেন। পদ্মজা অপরাধী কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'বেশি দেরি হয়ে গেছে আম্মা?'
'সমস্যা নেই। মুখ ধুয়ে খেতে আয়।'

পদ্মজা দ্রুত কলপাড়ে গিয়ে ব্রাশ করে,মুখ ধৌত করে। হেমলতা শিক্ষকের মেয়ে। তাই তাঁর মধ্যে নিয়ম-নীতির প্রভাব বেশি। মেয়েদের শক্তপোক্ত নিয়মে রেখে বড় করছেন। পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকে দেখল প্লেটে খাবার সাজানো। সে মৃদু হেসে প্লেট নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। তখন হেমলতা আসেন। পদ্ম দ্রুত ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকে। হেমলতার দেওয়া আরেকটা নিয়ম, খাওয়ার সময় মাথা ঢেকে খেতে হবে। পদ্মজা নিশ্চুপ থেকে শান্তভঙ্গিতে
খেতে থাকল । হেমলতা মেয়েকে সহজ কণ্ঠে বললেন, 'তাড়াহুড়ো করছিস কেন? মুখ ধুতে গিয়ে চুল ভিজিয়ে এসেছিস।খেয়ে রোদে বসে চুলটা শুকিয়ে নিবি ।'
'আচ্ছা,আম্মা।'
'আম্মা, পূর্ণা, প্রেমা আসে নাই?'
'পূর্ণা আসছে। স্কুলে গেছে। প্রেমা দুপুরে আসব।'
'আম্মা,আব্বা কবে আসবেন?'

পদ্মজার প্রশ্নে হেমলতা দাঁড়িয়ে পড়লেন। শুকনো গলায় জবাব দেন, 'জানি না। খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।'

হেমলতা চলে যেতেই পদ্মজার চোখ থেকে টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়ে পাতে। পদ্মজা দ্রুত হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। পদ্মজার জীবনে জন্মদাতা আছে ঠিকই। কিন্তু জন্মদাতার আদর নেই। সে জানে না তাঁর দোষটা কী? কেন নিজের বাবা বাকি বোনদের আদর করলেও তাকে করে না? কথা অবধিও বলেন না। দুইবার মাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে, 'আমি কী তোমাদের সত্যিকারের মেয়ে আম্মা? সন্তান হয় না বলে কি দত্তক এনেছিলে? আব্বা কেনো আমাকে এতো অবহেলা করেন? ও আম্মা বলো না?'

হেমলতা তখন নিশ্চুপ থাকেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'তুই আমার গর্ভের সন্তান। আর তোর বাবারই মেয়ে। এখন যা,পড়তে বস। অনেক পড়তে হবে তোর।'

ব্যস এইটুকুই! এর বেশি কিছু বলেন না হেমলতা। পদ্মজার কেন জানি মনে হয়,একদিন হেমলতা নিজ থেকে খুব গোপন কোনো কথা বলবেন। তবে সেটা যেন সহ্য করার মতো হয়। এই দোয়াই সারাক্ষণ করে সে।

'এতো কী ভাবছিস? তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠ।'

হেমলতার কথায় পদ্মজার ভাবনার সুতো ছিড়ল। দ্রুত খেয়ে উঠে। আজ আমের আচার বানানোর কথা ছিল।

_____

সন্ধ্যা কাটতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। কয়েক মাস হলো গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। আট গ্রাম মিলিয়ে অলন্দপুর। তাঁদের গ্রামের নাম আটপাড়া। প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধ্যারাত থেকে তিন ঘন্টা গ্রাম অন্ধকারে তলিয়ে থাকে। আর সারাদিন তো বিদ্যুৎ-এর নামগন্ধও থাকে না। বিদ্যুৎ দিয়ে লাভটা কী হলো? পদ্মজা,পূর্ণা,প্রেমা তিন বোন একসাথে পড়তে বসেছিল। বাড়ি অন্ধকার হতেই নয় বছরের প্রেমা খামচে ধরে পদ্মজার ওড়না। পদ্মজা মৃদু স্বরে ডাকল,
' আম্মা? আম্মা..."
' আয়,টর্চ নিয়ে যা।'

হেমলতার আহ্বানে পদ্মজা উঠে দাঁড়াল। প্রেমা অন্ধকার খুব ভয় পায়। পদ্মজার ওড়না ছেড়ে পূর্ণার হাত চেপে ধরে। টর্চ নিয়ে রুমে ঢোকার মুহূর্তে পদ্মজা গেইট খোলার আওয়াজ পেল। উঁকি দিয়ে হানিফকে দেখে সে দ্রুত রুমে ঢুকে পড়ল। হানিফ পদ্মজার সৎ মামা।

' বুবু...বাড়ি আন্ধার ক্যান!বাত্তি-টাত্তি জ্বালাও।' হানিফের কণ্ঠ।
' হানিফ আসছিস?'হেমলতা রুম থেকে বেরিয়ে বলেন। হাতে হারিকেন। হানিফ সবকটি দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'হ,আমি।'
'আয়,ভেতরে আয়।'
হানিফ বারান্দা পেরিয়ে বড় ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমার ছেড়িগুলান কই তে?'
'আছে রুমেই। পড়ছে।'
'এই আন্ধারেও পড়ে!'

হেমলতা কিছু বললেন না। হানিফ এই বাড়িতে আসলে কেন জানি খুব অস্বস্তি হয়। অকারণেই!

'ওদের খাওয়ার সময় হয়েছে। তুইও খেয়ে নে?'
'এইহানেই খামু? না তোমার সরাইখানাত যাইতে হইবো?'

কথাটায় রসিকতা ছিল। গ্রামে থেকেও হেমলতা খাওয়ার জন্য আলাদা রুম নির্বাচন করেছেন সেটা হানিফের কাছে রসিকতাই বটে! হেমলতা প্রশ্নের জবাব সোজাসাপটা না দিয়ে বললেন, 'খেতে চাইলে খেতে আয়।'

পদ্মজা কিছুতেই খেতে আসল না। কেমন জড়োসড়ো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, হানিফকে ভয় পাচ্ছে বা অবহেলা করছে। হানিফ ছয় বছর সৌদিতে ছিল। তিন মাস হলো দেশে ফিরেছে। তিন মাসে যতবার হানিফ এই বাড়িতে পা রেখেছে ততবারই পদ্মজা অজুহাত দিয়ে দূরে দূরে থেকেছে। হেমলতার বিচক্ষণ মস্তিষ্ক মুহূর্তে ভেবে নিল অনেক কিছু। তাই জোর করলেন না। আজই এই লুকোচুরির ফয়সালা হবে। হানিফ পদ্মজাকে দেখার জন্য অনেক ছলচাতুরী করল। কিছুতেই সুযোগ পেল না। বিদ্যুৎ আসার ঘন্টাখানেক পর হানিফ চলে যায়। পূর্ণা, প্রেমা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলল, 'কতবার না করেছি? লোকটার পাশে বেশিক্ষণ না থাকতে? তোরা কেনো শুনিস না আমার কথা?'

পূর্ণা ও প্রেমা বিস্ময়ে হতবিহ্বল। পদ্মজা কখনো তাদের এমন নিষেধ দেয়নি। তাহলে এখন কেন এমন বলছে?হেমলতা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা চুপসে গেল। 'পদ্ম আমার রুমে আয়।'

মায়ের এমন কঠিন কণ্ঠ শুনে পদ্মজার কলিজা শুকিয়ে আসে। হেমলতা নিজের ঘরে চলে যান।

হেমলতা মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজা নতজানু হয়ে কাঁপছে। সুন্দরীরা ভীতু আর বোকা হয় তার দৃষ্টান্ত প্রমাণ পদ্মজা। হেমলতার খুব মায়া হয় পদ্মজার সাথে উঁচুকণ্ঠে কথা বলতে। পদ্মজা রূপসী বলেই হয়তো! গোপনে আবেগ লুকিয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কী লুকোচ্ছিস? হানিফের সামনে কেন যেতে চাস না? সে কী করেছে? '

পদ্মজা ফোঁপাতে থাকে। হেমলতা সেকেন্ড কয়েক সময় নিয়ে নিজেকে সামলান। কণ্ঠ নরম করে বললেন, 'হানিফ ধড়িবাজ লোক! সৎ ভাই বলে বলছি না। আমি জানি। তাঁর ব্যাপারে যেকোনো কথা আমার বিশ্বাস হবে। তুই বল কী লুকোচ্ছিস?'

মায়ের আদুরে কণ্ঠে পদ্মজা আচমকা বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো হু হু করে কেঁদে উঠল।

চলবে....

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ২

_____

বাড়িটা মোড়ল বাড়ি নামে পরিচিত। পদ্মজার দাদার নাম ছিল মিয়াফর মোড়ল। তিনি গ্রামের একজন সম্মানিত লোক ছিলেন। ছয় কাঠা জমির উপর টিনের বিশাল বড় বাড়ি বানিয়েছিলেন চার ছেলের জন্য। দুই ছেলে ষোল বছর আগে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। দুজনই টগবগে যুবক ছিল। আর একজন আট বছর বয়সে কলেরা রোগে গত হলো। বাকি রইল মোর্শেদ মোড়ল। বর্তমানে এই বাড়ি মোর্শেদের অধীনে। যদিও তিনি থাকেন না সবসময়। পুরো বাড়ির চারপাশ জুড়ে গাছগাছালি। বাড়ির পিছনে নদী। রাত নয়টা বাজলেই পরিবেশ নিশুতি রাতের রূপ ধারণ করে। রাতের এই নির্জন প্রান্তর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে ছেয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার সাথে পদ্মজার ভাঙ্গা কান্না মিলেমিশে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে, কোনো আত্মা তার ইহজীবনের না পাওয়া কোনো বস্তুর শোকে এমন মরা সুর ধরেছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে পাশে বসান। পদ্মজা ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে হেমলতাকে বলল, 'মামা সৌদিতে যাওয়ার আগের দিন

আমাদের সবার দাওয়াত ছিল না নানাবাড়ি? খালামণি, ভাই-বোনেরা এসেছিল। সেদিন ঢাকা থেকে যাত্রার লোক আসছিল স্কুলে মনে আছে আম্মা?'

'আছে।'

উঠোনে ধপ করে একটা আওয়াজ হয়। হেমলতা,পদ্মজা কেঁপে উঠল। পূর্ণা, প্রেমা দরজায় কান পেতে রেখেছিল মা-বোনের কথা শুনতে। হুট করে কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হওয়াতে দুজন ভয় পেয়ে যায়। দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে রুমে ঢুকে পড়ে। হেমলতা বড় মেয়ের সাথে গোপন বৈঠক ভেঙে দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। উঠানে বিদ্যুৎ নেই। হারিকেন জ্বালান। পিছনে তিন মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন মায়ের তিন মেয়ে নিয়ে একা এতো বড় বাড়িতে বাস করাও যুদ্ধ বটে! হেমলতা গলা উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কে? কে ওখানে?'

'আমি।'

চির পরিচিত এই কণ্ঠ চিনতে হেমলতার বিড়ম্বনা হলো না। তিনি ব্যস্ত পায়ে উঠোনে নেমে আসেন। গেইটের পাশে মোর্শেদ মোড়ল পড়ে রয়েছেন। গায়ে চাদর। হাঁপড়ের মতো বুক উঠা-নামা করছে তার। যেন দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। হেমলতা দু'হাতে মোর্শেদকে আঁকড়ে ধরলেন। পদ্মজা,পূর্ণা, দৌড়ে আসে। মোর্শেদের এমফাইসিমা রোগ আছে। এ রোগে অল্প চলাফেরাতেই শ্বাসটানের উপক্রম হয় এবং দম ফুরিয়ে যায়। শ্বাস নেবার সময় গলার শিরা ভরে যায়। তিন মা-মেয়ে মোর্শেদকে ধরে রুমে নিয়ে আসে। মোর্শেদ এভাবেই হুটহাট করে বাড়ি ফেরে। কখনো কাকডাকা ভোরে, কখনো নিশুতি রাতে বা কখনো কাঠফাটা রোদে।

_____

মোর্শেদ মোড়লেই এমফাইসিমা রোগটা ধরা পড়ে সাত বছর আগে। মোর্শেদের অ্যাজমা ছিল। আবার ধূমপানে খুবই আসক্ত ছিলেন। ফলে ফুসফুসের এই রোগটি খুব দ্রুত আক্রমণ করে বসে। মোর্শেদ খানিকটা সুস্থ হয়ে রাত একটার দিকে ঘুমালেন। পূর্ণা, প্রেমা রুমে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। পদ্মজা বারান্দার রুমে ঝিম মেরে বসে আছেন। জানালার বাইরে চোখের দৃষ্টি। জোসনা গলে গলে পড়ছে! কি সুন্দর দৃশ্য! পদ্মজার মন বলছে, মা আসবে তাঁর খোঁজে। পুরোটা ঘটনা শুনতে আসবেই। সত্যি তাই হলো। কিছুক্ষণ পরই হেমলতা আসলেন।

'আম্মা, বাতিটা নিভিয়ে দাও।' বলল পদ্মজা। কণ্ঠ খাঁদে নামানো। হেমলতা বাতি নিভিয়ে পদ্মজার পাশে বসেন। পদ্মজা তৈরি ছিল তবুও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। সে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পদ্মজা তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। বয়স দশ ছিল। খুব কম বয়সেই তাকে স্কুলে পাঠানো শুরু করেন হেমলতা। সেদিন, নানাবাড়িতে সবার দাওয়াত পড়ে। হানিফ চলে যাবে সৌদিতে। তাই এতো আয়জন। পরিবারের মিলন আসর বসে। স্কুল মাঠেও সেদিন নাচ-গান অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ির সবাই সেখানেই চলে যায়। বাড়িতে থাকে শুধু পদ্মজা, পদ্মজার বৃদ্ধ নানা, আর হানিফ। পদ্মজা ঘুমে ছিল তাই বাকিদের সাথে যেতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙে আবিষ্কার করল বাড়িতে কেউ নেই। মোর্শেদ হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়াতে হেমলতা বাপের বাড়িতে উপস্থিত ছিল না।

' পদ্ম নাকি?'
পদ্মজা বাড়ি থেকে বের হওয়ার উপক্রম হতেই কানে আসে হানিফের ডাক। পদ্মজা মিষ্টি করে হেসে মাথা নাড়াল। হানিফের লোলুপ দৃষ্টি তখন পদ্মজার সারা শরীর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইটুকু মেয়ের ফর্সা চামড়া বিকৃত মস্তিষ্কের হানিফকে যেন বড্ড টানে!

'আয় তো, আমার ঘরে আয়।'

সহজ সরল শিশুসুলভ পদ্মজা মামার ডাকে সাড়া দিল। সে শুনেছে, মামা-ভাগনে যেখানে আপদ নেই সেখানে। অথচ, সেদিন সে মামাকেই ঘোর বিপদ হিসেবে জানল।

পদ্মজা রুমে ঢুকতেই হানিফ দরজা লাগিয়ে দিল।পদ্মজার মন কেমন করে উঠে হানিফের অদ্ভুত চাহনি আর দরজা লাগানো দেখে। হানিফ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করতে থাকে। পদ্মজার দেখতে খুব খারাপ লাগছে। ভয় করছে।

' এদিকে আয় তোর লগে গল্প করি।'

হানিফ বিছানায় বসে পদ্মজাকে কাছে ডাকে। পদ্মজা কাছে যেতে সংকোচ বোধ করে। হানিফ পদ্মজার ডান হাতে ধরে টেনে কোলে বসায়।

' তুই জানোস? তুই যে সবার থাইকা বেশি সুন্দর?'

Kobitor.com

হানিফের প্রশ্ন পদ্মজার কানে ঢুকেনি। সে মোচড়াতে থাকে হানিফের কোল থেকে নামার জন্য। আপত্তিকর স্পর্শ গুলো পদ্মজার খুব খারাপ লাগছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

'মোছড়াস ক্যান রে ছেড়ি। শান্তিমত বইয়া থাক। মামা মেলা থাইকা সাজনের জিনিষ কিইননা দিমু।'

হানিফ শক্ত করে দু'হাতে ধরে রেখেছে পদ্মজাকে। পদ্মজা কিছুতেই নামতে পারছে না।

'মামা, আমি চলে যাব।' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল পদ্মজা।

'কই যাবি? মামার ধারে থাক।' বলল হানিফ।

হানিফের শক্তপোক্ত হাতের স্পর্শগুলো শুধু অস্বস্তি দিচ্ছে না,স্পর্শকাতর জায়গাগুলো ব্যাথায় বিষিয়ে উঠছে। পদ্মজা কেঁদে উঠে। ভেজা কণ্ঠে বলল,
' বাড়ি যাব আমি। ব্যাথা পাচ্ছি মামা।'

হানিফ হাতের বাঁধন নরম করে আদুরে গলায় বলল,
' আচ্ছা, আর ব্যাথা দিতাম না। কান্দিস না।'

পদ্মজা চট করে কোল থেকে নেমে পড়ে। হানিফকে তার আজরাইল মনে হচ্ছে। মায়ের কাছে সে আজরাইলের অনেক গল্প শুনেছে। আজরাইল যখন জান নিতে আসবে তখন শরীরে খুব কষ্ট অনুভব হবে। এই মুহূর্তে যেন ঠিক তেমনই অনুভূতি হলো। তাহলে তার হানিফ মামাই আজরাইল। পদ্মজা দরজা খুলতে পারবে না। তাই হানিফকে ভীতিকণ্ঠে অনুরোধ করল,
' মামা দরজা খুলে দাও।'
'ক্যান? আমি তোরে যাইতে কইছি?'

হানিফের কর্কশ কণ্ঠের ধমকে পদ্মজা ভয়ে কেঁপে উঠল। তার চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে। হানিফ পদ্মজাকে জোর করে কোলে তুলে নেয়। পদ্মজা কাঁদছে। তার খুব ভয় লাগছে। বার বার বলছে, 'মামা আমি বাড়ি যাব।'

হানিফের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। বাড়িতে কেউ নেই। বৃদ্ধ সৎ বাবা কানে শুনে না। পদ্মজা হানিফকে কিল,ঘুষি দিতে থাকে। সেই সাথে জোরে জোরে কান্না শুরু করে। এভাবে কাঁদলে পাশের বাড়ির যে কেউ চলে আসবে। হানিফের রক্ত

টগবগ করছে উত্তেজনায়। সে দ্রুত ওড়না দিয়ে পদ্মজার মুখ, হাত, পা বেঁধে ফেলল। পদ্মজার দু'চোখের পানি হানিফের চোখে লাগেনি। হানিফ ভীষণ আনন্দ পাচ্ছে। পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছে! সে সিগারেট জ্বালায়। খুব আনন্দ হলে তার সিগারেট টানতে ইচ্ছে হয়। সিগারেট টানতে গিয়ে মাথায় আসে নৃশংস ইচ্ছে। নাক,মুখ দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে সিগারেট দুই আঙ্গুলের মাঝে রেখে পদ্মজার বাম পায়ের তালুতে চাপ দিয়ে ধরে রাখে।

পদ্মজা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হেমলতা দু'হাতে শক্ত করে মেয়েকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। পদ্মজা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ' আম্মা, তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আমার দমটা বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। আমি তোমাকে খুব ডাকছি আম্মা। তুমি আসোনি। '

পদ্মজার কথাগুলো হেমলতার বুক রক্তাক্ত করে দেয়। এ যেন ১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের নৃশংসতা। নিজের চোখে তিনি দেখেছেন পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতা। হানিফ আর তার দেখা অত্যাচারী পাকিস্তানিদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। হেমলতা নির্বাক,বাকরুদ্ধ। শুধু অনুভব হচ্ছে, তার বুকে পড়ে আদরের পদ্মজা হাউমাউ করে কাঁদছে। সর্বাঙ্গ যেন কাঁপছে। হানিফকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে হাত নিশপিশ করছে। সেদিন একটুর জন্য পদ্মজা ধর্ষণ হয়নি। বাড়িতে সবাই ফিরে এসেছিল। পদ্মজা পোড়া স্থানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়।

বাকিটুকু আর পদ্মজাকে বলতে হয়নি,হেমলতা জানেন। পদ্মজার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসে। একুশ দিন বিছানায় ছিল। ততদিনে হানিফ দেশ ছেড়ে চলে যায়। পদ্মজা ভয়ে, লজ্জায় ঘটনাটি কাউকে বলেনি। পায়ের পোড়া দাগ দেখে যখন হেমলতা প্রশ্ন করেছিল, 'পা এমনভাবে পুড়ল কি করে?'

পদ্মজা সহজভাবে জবাব দিয়েছিল, ' চুলার কাছে গিয়েছিলাম। চুলার লাকড়ির আগায় পা লাগছিল।'

কথাটা পদ্মজা সাজিয়েই রেখেছিল। সাথে অনেক যুক্তি। তাই মিথ্যে বলতে একটুও কাঁপেনি। পুরো ঘটনাটা পদ্মজার বুকে তাজা হয়ে আছে। এই ছয় বছরে লুকিয়ে কতবার কেঁদেছে সে। সবসময় চুপ করে কোথাও বসে থেকেছে। হেমলতা মেয়ের নিশ্চুপতা দেখে মাথা ঘামাননি। কারণ,পদ্মজা ছোট থেকেই চুপচাপ ছিল। কিন্তু আজ হেমলতার খুব আফসোস হচ্ছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তিনি ভেবেছিলেন, তার তিনটা মেয়েই তার কাছে খোলা বইয়ের মতো। চাইলেই পড়া যায়। বিশেষ করে পদ্মজাকে বাড়ির পিছনের নদীর বুক দিয়ে তরতর করে বয়ে

যাওয়া স্বচ্ছ টলটলে পানির মতো মনে হতো। যার জীবনে অস্বচ্ছ বলতে কিছু নেই। সবই সাদামাটা, সহজ সরল। অথচ, পদ্মজার জীবনেই কত বড় দাগ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে! কতবড় ঘটনা লুকিয়ে ছিল! মেয়েরা কথা লুকিয়ে রাখার সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। কথাটি নিজের মেয়েদের ক্ষেত্রে মাথায়ই আসেনি। পদ্মজা শান্ত হলে হেমলতা বললেন, 'পা টা দেখি।'

পদ্মজা বাঁ পা বিছানায় তুলল। হেমলতা পদ্মজার পা কোলে নিয়ে পোড়া দাগটা দেখেন মনোযোগ দিয়ে। রক্ত টগবগ করে উঠে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিংস্রতা যেন লুটোপুটি খাচ্ছে।

'এই পোড়া দাগ হানিফের রক্ত দিয়ে মুছবো।'

কথাটি কত সহজ করে বলেছেন হেমলতা। তবুও পদ্মজা কেঁপে উঠল। কী যেন ছিল কথাটিতে! শরীরের পশম দাঁড়িয়ে পড়ে। হেমলতা বারান্দার রুম ছেড়ে বড় ঘরে ঢুকেন। মিনিট কয়েক পর, রামদা, ছুরি হাতে নিয়ে উঠোনে যান। উঠোনের এক পাশে শক্ত পাথর আছে। ছুরিটা পাথরে ঘষতে থাকলেন সাবধানে। ঘষতে ঘষতে পাথর গরম হয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। মানে ধার হয়ে গেছে। পদ্মজা বারান্দা থেকে দেখছে। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে। হেমলতা বারান্দা পেরিয়ে রুমে ঢুকতে যাবে তখন পদ্মজা উৎকণ্ঠিত গলায় ডাকল, 'আম্মা!'

'আন্নার চাচার এক মেয়ে নিখোঁজ শুনেছিস তো বড়দের মুখে? সেই মেয়ের ধর্ষক হানিফ। ধর্ষণের পর পুঁতে ফেলেছে। অলন্দপুরের এই একটা মানুষই এতোটা নৃশংস। আমি তখন ঢাকা পড়তাম। বাড়ি এসে জানতে পারি ঘটনা। আম্মার অনুরোধ আর কান্নায় আমি সেদিন মুখ খুলিনি। এত বড় পাপ চেপে যাই। সেই শাস্তি আমি ধীরে ধীরে পাচ্ছিলাম। আজ পুরোপুরি পেয়ে গেলাম। আমার পাপের শাস্তি শেষ হয়েছে।'

হেমলতা কথা শেষ করে জায়গা ত্যাগ করলেন। কী ধারালো প্রতিটি বাক্য! হেমলতার মুখ দিয়ে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। পদ্মজার মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে পড়ে।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

_____
'আপা,স্কুলে যাবা না?' পূর্ণা পদ্মজাকে জিজ্ঞাসা করল।
'যাব।'
'তাড়াতাড়ি করো।'

তাড়া দিয়ে পূর্ণা বাড়িতে ঢুকল। পদ্মজা বাড়ির পিছনের নদীর ঘাটে উদাসীন হয়ে বসে আছে। এ নদীর নাম মাদিনী (ছদ্মনাম)। গ্রীষ্মকাল বিদায়ের তিন সপ্তাহ চলছে। এখন বর্ষাকাল। মাদিনী জলে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সে যেন স্রোতস্বিনী। ঘোলা জলের একটানা স্রোত বয়ে যায় সাগরের দিকে। উজান থেকে ভেসে আসছে ঘন সবুজ কচুরিপানা। পদ্মজার এই দৃশ্য দেখতে বেশ লাগে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে মাদিনীর স্বচ্ছ জলের দিকে। মাদিনীর বুকের উপর দিয়ে একটা লঞ্চ যাচ্ছে। লঞ্চ দেখে এক মাস আগের ঘটনা মনে পড়ল তাঁর। সেদিন রাতে হেমলতা ছুরি ধার দিয়ে রুমে ঢুকে গেলেন। পদ্মজা কাঁপা পায়ে রুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নামায পড়ে খেতে বসল। তখন হিমেল হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে। হিমেল হচ্ছে হেমলতার ছোট ভাই।

' আপা? এই পদ্ম, আপা কই? ' হিমেলের কণ্ঠ।
' কি হইছে মামা?' জবাব দিল পদ্মজা।
পদ্মজার প্রশ্ন উপেক্ষা করে হেমলতাকে হিমেল ডাকল,' আপা,এই আপা।'
হেমলতা বাড়ির পিছন থেকে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসেন।
' কি হয়েছে?'
হিমেল হেমলতাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।
' আপা, ভাইজান খুন হইছে। রাইতে কে জানি মাইরা ফেলছেরে আপা..."

হিমেল কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। পদ্মজা তাৎক্ষণিক সন্দিহান চোখে মায়ের দিকে তাকাল। হেমলতাকে দেখে মনে হলো, তিনি চমকেছেন। অথচ, তার চমকানোর কথা ছিল না। নাকি হিমেলের সামনে অভিনয় করলেন?

' পূর্ণা,প্রেমাকে ওদিক আসতে দিস না পদ্ম। আমি আসছি।'

হেমলতা বাড়ির বাইরে মিলিয়ে যান। হিমেল পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ছেলেটা বোকাসোকা, জন্মগত প্রতিবন্ধী। বাইশ বছরের হিমেল এখনো শিশুদের মতো আচরণ করে। কথায় কথায় খুব কাঁদে। সেখানে তার ভাই খুন হয়েছে। এক মাস তো প্রতিদিন নিয়ম করে কাঁদবে।

পদ্মজা রাতেই ভেবেছিল এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবুও এখন ভয় পাচ্ছে খুব। পুলিশ কী এসেছে? মাকে কী ধরে নিয়ে যাবে? ভাবতে গিয়ে, পদ্মজার বুক ধক করে উঠল। গ্রামের কাছেই শহর, থানা। পুলিশ নিশ্চয় চলে এসেছে। পদ্ম ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। সে ঘামছে খুব। নাক,মুখ,গলা ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা খুনের কথা শুনেই খুব ভয় পেয়েছে। তার মনে হচ্ছে সেও খুন হবে। খুব বেশি ভীতু পূর্ণা। পদ্মজার শরীর কাঁপতে থাকে। চোখে ভাসছে, হেমলতাকে পুলিশ শিকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। তার খুব কান্না পাচ্ছে। আর সময় নষ্ট না করে তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াল পদ্মজা। মাথায় ওড়নার আঁচল টেনে নিয়ে পূর্ণার উদ্দেশ্যে বলল,
' প্রেমারে দেখে রাখিস বোন। '

বাড়ি ভর্তি মানুষ। আরো মানুষ আসছে। হেমলতা মানুষজনকে ঠেলে হানিফের লাশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন ফর্সা রঙের দুই জন মহিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। আকস্মিক আক্রমণে হেমলতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। খেয়াল করে দেখেন, দুজন মহিলা তাঁর মা আর বোন। তারা হাউমাউ করে কাঁদছে। কিন্তু হেমলতার তো কান্না পাচ্ছে না। ব্যাপারটা লোকচক্ষু ঠেকছে না? একটু কী কান্নার অভিনয় করা উচিৎ? হানিফের মৃত দেহ দেখে মনে হচ্ছে কেউ ইচ্ছেমতো কুপিয়েছে। হেমলতার তা দেখে শান্তি লাগছে! এমন শান্তি অনেকদিন পাওয়া হয়নি। পদ্মজা সেখানে উপস্থিত হয়। হেমলতার নজরে পড়ে। ভীতু চোখে মায়ের চোখের দিকে তাকাল পদ্মজা। হেমলতা ভ্রু কুঞ্চিত করে আবার স্বাভাবিক করে নেন। পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে দেখছে পুলিশ এসেছে নাকি। চারিদিকে এতো মানুষ। পদ্মজাকে এদিক ওদিক উঁকি দিতে দেখে হেমলতা এগিয়ে আসেন। চোখমুখ শক্ত করে পদ্মজার মুখ ঘুরে দেন। পদ্মজা দ্রুত ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে গোয়ালঘরে ঢুকে পড়ল। তার মা চায় না সে কখনো এতো মানুষের সামনে থাকুক।
হেমলতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, পদ্মজা গোয়ালঘর থেকে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ আসল। জিজ্ঞাসাবাদ করে হানিফের লাশ নিয়ে গেল। লোকমুখে শোনা যায়, হানিফ খুন হয়েছে শেষ রাতে। এরপর নদীতে ফেলা দেওয়া হয়। লঞ্চ ঘাটে লাশ ভাসে।
হেমলতাকে পুলিশ নিয়ে যায়নি বলে পদ্মজা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। মানুষের ভীরও কমে গেছে। হেমলতার মা কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে উঠোনের এক কোণে বসে আছেন। পদ্মজা গুটি পায়ে গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে আসল। হেমলতা পদ্মজার

দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। সেই হাসি দেখলেন হেমলতার মা মনজুরা। তিনি কিছু একটা ভেবে নেন। হেমলতার কাছে এসে কিড়মিড় করে বলেন, 'তুই খুন করছস?'

' তোমার কেন মনে হচ্ছে এমন?'

হেমলতার কণ্ঠ স্বাভাবিক। অথচ, পদ্মজা এই প্রশ্ন শুনে ভয় পেয়েছে খুব। যদি নানু পুলিশকে বলে দেয়? পুলিশ তো তার মাকে নিয়ে যাবে!

' কাইল রাইতে তুই আইছিলি হানিফের ঘরে। আমি দেহি নাই?' রাগে কাঁপছেন মনজুরা।
' হুম আসছি।' হেমলতার নির্বিকার স্বীকারোক্তি।
'কেন মারলি আমার ছেড়ারে? তোর কি ক্ষতি করছে? '
' আসছি বলেই আমি খুন করেছি?'
' এতো রাইতে তুই তার কাছে আর কী দরকারে আইবি?'
'আমি তাকে মারতেই যাব কেন?'

মনজুরা আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন হেমলতার দিকে। হেমলতার চোখ মুখ শক্ত। নিস্তব্ধতা কাটিয়ে মনজুরা চেঁচিয়ে উঠলেন, ' পুলিশের কাছে যামু আমি।'

পদ্মজা কেঁদে উঠল। অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে, 'নানু এমন করো না।'

হেমলতা নীচু স্বরে কঠিন করে বললেন, ' আমার মেয়েদের থেকে আমাকে দূরে সরানোর চেষ্টা করো না আম্মা। ফল খুব খারাপ হবে।'

পদ্মজার মনে হলো মনজুরা ভয় পেয়েছেন। মনজুরা সবসময়ই হেমলতাকে ভয় পান। তিনি চুপসে যান। শুধু ঘৃণা ভরা দৃষ্টি নিয়ে হেমলতার দিকে তাকিয়ে থাকেন। পদ্মজা বুঝে উঠতে পারে না, তার নানু কেন ভয় পায় মাকে? মায়ের অতীতে কী ঘটেছে? কেন তিনি এমন কাঠখোট্টা? ছেলের খুনীকে কোনো মা ছেড়ে দেয়? নানু কেন ছাড়লেন? মেয়ে বলে? নাকি অন্য কারণ? কোনো উত্তর নেই। এসব ভাবলে উল্টো মাথা ব্যাথা ধরে। অন্য আট-দশটা পরিবারের মতো কেনো না তারা? নাকি গোপনে সব পরিবারেই এমন জটিলতা আছে? প্রশ্ন হাজারটা! উত্তর কোথায়?

সেদিন রাতে খাওয়ার সময় হেমলতা নিম্নস্বরে পদ্মজাকে বললেন, 'পদ্ম?'
'জ্বি,আম্মা।'
'আমি হানিফকে খুন করিনি। কারা করেছে তাও জানিনা।'

কথাটি শুনে পদ্মজা খুব চমকায়। তার মা মিথ্যে বলে না। তাহলে কারা খুন করল? পদ্মজা প্রশ্ন করল, 'তাহলে শেষ রাতে মামার কাছে কেন গিয়েছিলে আম্মা?'

হেমলতা জবাব দেননি। খাওয়া ছেড়ে উঠে যান।

পদ্মজার ভাবনার সুতো কাটল কারো পায়ের আওয়াজ শুনে। ঘাড় ঘুরিয়ে মোর্শেদকে দেখতে পেল। মোর্শেদ পদ্মজাকে ঘাটে বসে থাকতে দেখে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকান।

' এই ছেড়ি যা এন থাইকা। '

পদ্মজার কান্না পায়। খুব খারাপ লাগে। নিঃশব্দে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। তা আড়াল করে ব্যস্ত পায়ে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

_____

কয়েক মাস পর পদ্মজার মেট্রিক পরীক্ষা। তিন বোন বই নিয়ে সড়কে উঠল। পদ্মজার কোমর অবধি ওড়না দিয়ে ঢাকা। পূর্ণা একনাগাড়ে বকবক করে যাচ্ছে। স্কুলে যাওয়া অবধি কথা বন্ধ হবে না। মাঝে মাঝে জোরে জোরে হাসছে। মেয়েটার হাসির রোগ আছে বোধহয়। একবার হাসি শুরু করলে আর থামে না। পদ্মজা বার বার বলছে, 'আম্মা রাস্তায় কথা বলতে আর হাসতে মানা করছে। চুপ কর না।'

তবুও পূর্ণা হাসছে। বাড়ির বাইরে এসে সে মুক্ত পাখির মতো আচরণ করে। তাকে দেখে মনে হয়, খাঁচা থেকে মুক্ত হয়েছে।

' পদ্ম... ওই পদ্ম। খাড়া।'

পদ্মজা ক্ষেতের দিকে তাকাল। লাবণ্য ক্ষেতের আইল ভেঙে দৌড়ে আসছে। লাবণ্য আর পদ্মজা এক শ্রেণীতে পড়ে। লাবণ্য কাছে এসে হাঁপাতে থাকল। শান্ত হওয়ার পর চারজন মিলে স্কুলের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল।

' বাংলা পড়া শিখে এসেছি আজ?'

পদ্মর প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে লাবণ্য বলল, 'আরে ছেড়ি বাড়িত শুদ্ধ ভাষায় কথা কইলে বাইরেও কইতে হইব নাকি?'

'আমি আঞ্চলিক ভাষা পারি না।'

লাবণ্য অসন্তোষ প্রকাশ করল। সে অলন্দপুরের মাতব্বর বাড়ির মেয়ে। তাদের বাড়ির সবাই শিক্ষিত। তবুও তাঁরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। পরিবারের দুই-তিন জন সদস্য ছাড়া। আর পদ্মজার চৌদ্দ গুষ্ঠি মূর্খ,দুই-তিন জন ছাড়া। তবুও এমন ভাব করে! আঞ্চলিক ভাষা নাকি পারে না!

'সত্যি আমি পারি না। ছোট থেকে আম্মা শুদ্ধ ভাষা শিখিয়েছেন। উনিও বলেন। তাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেই আরাম পাই।'
' পূর্ণা তো পারে। '
'আমার চেষ্টা করতে ইচ্ছে হয় না।'
' আইচ্ছা বাদ দে। শুন, কাইল আমরার বাড়িত নায়ক-নায়িকারা আইব।'

পূর্ণা বিগলিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন আসব? কোন নায়ক?'

' শুটিং করতে। ছবির শুটিং।'

পদ্মজা এসবে কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না। পূর্ণা খুব আগ্রহবোধ করছে। সপ্তাহে একদিন সুমিদের বাড়িতে সাদাকালো টিভিতে সে ছায়াছবি দেখতে যায়। তাই অভিনয় শিল্পীদের প্রতি তার আগ্রহ আকাশছোঁয়া। পূর্ণা গদগদ হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'কোন নায়ক নায়িকা? বল না লাবণ্য আপা!'

' দাঁড়া! মনে করি। '

পূর্ণা কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। লাবণ্য চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল। এরপর মনে হতেই বলল, 'লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী।'
'তুমি আমার ছবির নায়ক-নায়িকা?'
'হ।'

স্কুলের যাওয়ার পুরোটা পথ লাবণ্য আর পূর্ণা ছায়াছবি নিয়ে আলোচনা করল। মূল বক্তব্যে ছিল লিখন শাহ।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৪

_____

দিনটাকে পদ্মজার অলক্ষুণে মনে হচ্ছে। সকালে উঠে দেখল, লাল মুরগিটার একটা বাচ্চা নেই। নিশ্চয় শিয়ালের কারবার। রাতে মুরগি খোপের দরজা লাগানো হয়নি। আর এখন আবিষ্কার করল, দেয়াল ঘড়িটার কাঁটা ঘুরছে না। ঘড়িটা রাজধানী থেকে হানি খালামণি দিয়েছিলেন। গ্রামে খুব কম লোকই হাত ঘড়ি পরে। দেয়াল ঘড়ি হাতেগুণা দুই-তিনজনের বাড়িতে আছে। পদ্মজা সূর্যের দিকে তাকিয়ে সময়ের আন্দাজ করার চেষ্টা করল। পূর্ণা, প্রেমা দুপুরে খেয়েই ঘুম দিয়েছে। পদ্মজা মায়ের রুমে উঁকি দিল। হেমলতা মনোযোগ দিয়ে সেলাই মেশিনে কাপড় সেলাই করছেন। আটপাড়ায় একমাত্র হেমলতাই সেলাই কাজ করেন। প্রতিটি ঘরের কারো না কারো পরনে তার সেলাই করা কাপড় আছেই।

'লুকিয়ে দেখছিস কেন? ঘরে আয়।'
হেমলতার কথায় পদ্মজা লজ্জা পেল।
'না আম্মা। কাজ আছে। '
'পানি দিয়ে যা।'
হেমলতা জগ বাড়িয়ে দেন। পদ্মজা জগ হাতে নিয়ে বলল, 'আম্মা,ছদকা কোন মুরগিটা দেব?'

হেমলতা গতকাল স্বপ্নে দেখেছেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। তাই তিনি ছদকা দিবেন বলে মনস্থির করেছেন। সকালেই পদ্মজাকে মনের কথা জানালেন।

' সাদা মোরগটা দিয়ে দিস। মুন্না কি আসছে?'
'না। প্রতিদিন বিকেলবেলা তো পানি নিতে আসে। কিছুক্ষণ পরই আসবে।'

হেমলতা আর কথা বাড়ালেন না। পদ্মজা কলপাড় থেকে পানি নিয়ে আসে। আছরের আযানের সাথে সাথে মুন্না আসল। গ্রামে সচ্ছল পরিবার নেই বললেই চলে। হাতে গোনা কয়েকটা পরিবারে সচ্ছলতা আছে। হেমলতার পরিবারটা টিকে আছে, হেমলতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের জন্য। পুরো আটপাড়ায় টিউবওয়েল মাত্র পাঁচটা। পদ্মজাদের টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে প্রতিদিন অনেকেই আসে। তার মধ্যে নিয়মিত একজন মুন্না। দশ বছরের একটা ছেলে। মা নেই। বাবা পঙ্গু। সদরে বসে ভিক্ষা করে। পদ্মজা মোরগ নিয়ে কলপাড়ে এসে দেখে মুন্না নেই। একটু সামনে হেঁটে এসে ঘাটে মুন্নাকে দেখতে পেল। ডাকল,'মুন্না।'

মুন্না ফিরে তাকায়। পদ্মজার হাতে সাদা মোরগ দেখে মুন্না খুব খুশি হয়। পদ্মজা না বললেও বুঝে যায়, ছদকা পাবে আজ। মুন্না এগিয়ে আসল। দাঁত কেলিয়ে হাসল।

'হাসিস কেন? নে মোরগ। তোর আব্বাকে নিয়ে খাবি।'

মুন্না যে খুব খুশি হয় তা দেখেই বোঝা গেল। খুশিতে গদগদ হয়ে মোরগটাকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মজার ঠোঁট দুটি নিজেদের শক্তিতে প্রশান্তির হাসিতে মেতে উঠল। কী সুন্দর মুন্নার হাসি! পদ্মজা বলল, 'খুব খুশি?'
'হ।'
'দোয়া করবি আমরা যেন ভাল থাকি।'
'করবাম আপা।'
'আচার খাবি মুন্না?'
'হ,খাইবাম।'

পদ্মজা আবার হাসল। মুন্না পেটুক। খাওয়ার কথা শুনলেই চোখ চকচক করে উঠে। পদ্মজা আচার নিয়ে আসে। মুন্নার সাথে বসে আরাম করে খায়। মুন্না একটু একটু করে খেতে খেতে বলল, 'আপা, তুমি খুব ভালা।'
'তাই?'
'হ।বড় হইয়া তোমারে বিয়া করবাম আমি।'

পদ্মজা বিষম খেল। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ শুনল নাকি। বিয়ে তার কাছে খুব লজ্জাজনক শব্দ। বিয়ে নামটা শুনলেই লজ্জায় লাল টুকটুকে হয়ে যায়। ফিসফিসিয়ে মুন্নাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ের কথা কোথায় শিখলি?'
' আব্বা কইছে।'
' আর বলবি না এসব। যা,বাড়িত যা।'

পদ্মজা তড়িঘড়ি করে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, হেমলতা রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ থাকে না। হারিকেন জ্বালিয়ে রান্না করতে হয়। প্রতিদিন ঘরে একটা হারিকেন আর রান্নাঘরে একটা হারিকেন জ্বালানো অনেক খরচের ব্যাপার। তাই তিনি বিকেলে রাতের রান্না সেড়ে ফেলেন।

'আম্মা আমি রাঁধি?'
'লাগবে না। সাহায্য কর শুধু।'

পদ্মজা চোখ ঘুরিয়ে দেখল, কী কাজ করা যায়। কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। হেমলতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, ' লাউ নিয়ে আয়।'
'ছিড়ে আনব? না লাহাড়ি ঘরে আছে?'
'লাহাড়ি ঘরে নাই।'

পদ্মজা মায়ের আদেশ পেয়ে যেন চাঁদ পেয়েছে। এমন ভাব ধরে দ্রুত ছুটে যায় লাউ আনতে। লাউ,বরবটি, ঢেঁড়স, কাঁকরোল, করলা, চিচিঙ্গা, পটল, ঝিঙা.. ইত্যাদি, ইত্যাদি সব রকমের সবজির মেলা বাড়ির চারপাশ ঘিরে। পদ্মজা সাবধানে ঘাসের উপর দিয়ে লাউ গাছের দিকে এগোয়। বর্ষাকাল হওয়াতে জোঁকের উপদ্রব বেড়েছে। জোঁকের ভয় অবশ্য নেই তার।

হেমলতা পদ্মজার যাওয়া পানে ঝিম মেরে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটাকে দেখলে তার মন বিষণ্নতায় ভরে উঠে। পদ্মজার চুল দেখলে মনে হয়, এই সুন্দর ঘন কালো রেশমী চুল পদ্মজার একেকটা কাল রাত। পদ্মজার ছিমছাম গড়নের দুধে আলতা দেহের অবয়ব দেখলে মনে হয়, এই দেহ পদ্মজার যন্ত্রণা। এই দেহ ধ্বংস হবে। পদ্মজার ওষ্ঠদ্বয়ের নিম্নে স্থির হয়ে থাকা কালো সূক্ষ্ম তিল দেখলে মনে হয়, এই তিল পদ্মজার এক জীবনের কান্নার কারণ। হেমলতা পদ্মজার রূপের বাহার নিতে পারেন না। কেন কৃষ্ণকলির ঘরে ভুবন মোহিনী রূপসীর জন্ম হলো! জন্ম,মৃত্যু, বিয়ে কারো হাতে থাকে না। যদি থাকতো, হেমলতা মোর্শেদকে বিয়ে করতেন না এবং পদ্মজার মতো রূপসীর জন্ম দিতেন না। আল্লাহর কাছে,রূপসী মেয়ে ভুলেও চাইতেন না। হেমলতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

_____
আজ শুক্রবার। স্কুল নেই। ফজরের নামায পড়ে তিন বোন পড়তে বসেছে। প্রেমা নামায পড়তে চায় না। ঘুমাতে চায়। হেমলতার মারের ভয়ে নামায পড়ে। সে ঝিমুচ্ছে আর পড়ছে। তা দেখে পদ্মজা আর পূর্ণা ঠোঁট টিপে হাসছে। হেমলতা বিরক্ত হোন। প্রেমার তো পড়া হচ্ছেই না। সেই সাথে পদ্মজা, পূর্ণার মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। তিনি কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, 'প্রেমা,ঘুমাচ্ছিস কেন? ঠিক হয়ে পড়।'

প্রেমা সচকিত হলো। চট করে চোখ খুলে, ভয়ে তাড়াতাড়ি পড়া শুরু করল। হেমলতা কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'পড়তে হবে না। ঘরে গিয়ে ঘুমা।'

প্রেমা একটু অবাক হয়। পরেই খুশি হয়ে ছুটে যায় ঘরে। পূর্ণা মুখ ভার করে ফেলল। তার ও তো পড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু, মা কখনো তাকে ছাড় দেন না।

হয়তো ছোটবেলা ছাড় দিতেন। মনে নেই। সে আবার খুব দ্রুত সব ভুলে যায়। ব্রেন ভাল প্রেমার। যা পড়ে মনে থাকে। পূর্ণা খুব দ্রুত ভুলে যায়। পদ্মজার সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু রূপ বাদে।

সূর্য উঠার সাথে সাথে মোর্শেদ বাড়িতে ঢুকেন। হাতে ঝাকি জাল আর বড়শি। কাঁধে পাটের ব্যাগ ঝুলানো। ভোরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। মোর্শেদ বাড়ি ফিরলে পূর্ণা আর প্রেমা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। মাছ খেতে পারে অনেক। অর্থের জন্য হেমলতা খুব কম মাছ আনেন। মোর্শেদ বাড়িতে যতদিন থাকেন ততদিন মাছের অভাব হয় না। মোর্শেদ বলার পূর্বেই পূর্ণা ও প্রেমা গামলা নিয়ে ছুটে আসে উঠানে। মোর্শেদ কাঁধের ব্যাগ উল্টে ধরেন গামলার উপর। পুঁটি, ট্যাংড়া, পাবদা,চিংড়ি মাছের ছড়াছড়ি। হেমলতা ভারী খুশি হোন। পদ্মজা লতা দিয়ে চিংড়ি খেতে খুব পছন্দ করে। আর প্রেমা, পূর্ণা পছন্দ করে পাবদা মাছের ভুনা। মেয়েগুলো খুব খুশি হয়েছে মাছ দেখে। তিনি জানেন, মোর্শেদ বাড়ি থেকে বের হতেই পদ্মজা ছুটে যাবে বাড়ির পিছনে লতা আনতে।

'হুনো, লতা। আমার আম্মারারে পাবদা ভুনা কইরা দিবা। সবজি টবজি দিয়া রাঁনবা না।'
'আব্বা,আপনি বাড়িতে থাকবেন? তাইলে তো প্রতিদিনই মাছ খেতে পারি।'

মোর্শেদ আড়চোখে পদ্মজাকে একবার দেখে তীক্ষ্ণ চোখে হেমলতার দিকে তাকান। এরপর পূর্ণাকে জবাব দিলেন, 'কোনোরহম অশান্তি না হইলে তো থাকবামই।'

গামছা নিয়ে তিনি কলপাড়ে চলে যান। পদ্মজার মুখটা ছোট হয়ে যায়। প্রতিবার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে মোর্শেদ পদ্মজাকে রাগে কটুকথা শোনান। তখন, হেমলতা মোর্শেদকে শাসান। ফলস্বরূপ মোর্শেদ বাড়ি ছাড়েন।

'মোর্শেদ নাকি? বাড়ি ফিরলা কোনদিন?'

মোর্শেদ গোসল সেড়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন। সকালের মিষ্টি রোদ। ঘাড় ঘুরিয়ে রশিদ ঘটককে দেখে হাসলেন।

'আরে মিয়া চাচা। আহেন, আহেন। পূর্ণারে চেয়ার আইননা দে। খবর কী?'

পূর্ণা চেয়ার এনে দিল। রশিদ এক দলা থুথু উঠানে ফেলে চেয়ারে বসলেন আরাম করে। প্রেমাকে উঠানে খেলতে দেখে ফরমায়েশ দিলেন, 'এই মাইয়া যা পানি লইয়া আয়। অনেকক্ষণ ধইরা দমডা আটকাইয়া আছে।'

প্রেমা পানি নিয়ে আসে। রশিদ পানি খেয়ে মোর্শেদকে বললেন, 'খবর তো ভালাই। বাবা ছেড়িডারে কী বিয়া দিবা না?'
'দুই বছর যাক। পড়তাছে যহন,মেট্রিকটা পাশ করুক। কী কন?'
'মেজোডা না। বড়ডা। তোমার বউ তো মরিচের লাহান। কোনোবায়ও রাজি অয় না। তুমি বোঝাওছেন। পাত্র খাঁটি হীরা। বাপ-দাদার জমিদারি আছে। '

মোর্শেদ আড়চোখে হেমলতা এবং পদ্মজার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। নেই তারা। তিনি জানেন, পদ্মজার উপর কোনোরকম জোরজবরদস্তি তিনি করতে পারবেন না। হেমলতা তা হতে দিবেন না। এসব তো আর বাইরের মানুষের সামনে বলা যায় না। মোর্শেদ রশিদ ঘটককে নরম গলায় বললেন, 'থাকুক না পড়ুক। মায়ে যহন চায় ছেড়ি পড়ুক। তাইলে পড়ুক।'

রশিদ নিরাশ হলেন। ভেবেছিলেন, মোর্শেদ রাজি হবে। তিনি মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন। এরপর বড় অসুখে পড়লেন। তাই মোর্শেদ বাড়ি ফিরেছে শুনেও আসতে পারেননি। আজ একটু আরামবোধ হতেই ছুটে এসেছেন অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু মোর্শেদের জবানবন্দিতে তিনি আশাহত হলেন। কটমটে গলায় বললেন, 'যুবতী ঘরে রাহন ভালা না। যহন বংশে কালি পড়ব তহন বুঝবা। হুনো মোর্শেদ, এই বয়সী মাইয়াদের স্বভাব চরিত্র বেশিদিন ভালা থাহে না। পাপ কাম এদের চারপাশে ঘুরঘুর কর। বেলা থাকতে জামাই ধরাইয়া দেওন লাগে। বুঝছোনি? তোমার বউরে বোঝাও।'

রশিদ, পাত্রের অনেক প্রশংসা করলেন। জমিজমা, বাড়িঘর সবকিছুর বাড়াবাড়ি রকমের বর্ণনা দিলেন। ফলে,মোর্শেদের মস্তিষ্ক কাজ করা শুরু করল। রশিদ ঘটক যেতেই তিনি হেমলতার পাশে গিয়ে বসেন। ইনিয়েবিনিয়ে পদ্মজার বিয়ের কথা তুলেন। হেমলতা সাফ নাকচ করে দেন। তিনি শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে দেন, পদ্মজার বিয়ে তিনি দিচ্ছেন না। আর মোর্শেদকে পদ্মজার ব্যাপারে নাক গলাতে না করেছেন। শেষ কথাটা বেশ কঠিন করেই বলেন, 'আগে বাপ হও। পরে বাপের কাজ করতে আসবা।'

মোর্শেদের তিরিক্ষি মেজাজ। তিনি রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। রগে রগে রাগ টগবগ করছে। পদ্মজাকে বারান্দায় দেখে তিনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন, 'ছেড়ি

যহন রূপ দিয়া নটি হইব। তহন আমার ঠ্যাংও পাইবা না। এই ছেড়ি মজা বুঝাইবো।
'

পদ্মজার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হেমলতা রান্নাঘর থেকে বের হলেন মোর্শেদকে কিছু কঠিন কথা শোনাতে। পদ্মজা তখন দৌড়ে আসে। হেমলতার হাতে ধরে রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। মোর্শেদ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তারও খুব ভাল লাগে। পূর্ণা,প্রেমা কত খুশি হয়। বাড়িটা পরিপূর্ণ লাগে। সে চায় না তার বাবা ঝগড়া করে রাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাক। হেমলতা রাগে এক ঝটকায় মেয়ের হাত সরিয়ে দেন। তার সহ্য হয় না মোর্শেদকে। মানুষের কথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বদমেজাজি একজন মানুষ মোর্শেদ। ভালটা কখনো বুঝে না। মানুষের কথায় নাচে। সারাক্ষণ মস্তিষ্কে একটা বাক্যেরই পূজা করে, 'মানুষ কী বলবে? '

_____

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মাথার উপর বৃষ্টি নিয়ে মোর্শেদ বাড়ি ফেরেন। মুখ দেখে বোঝা গেল, তিনি খুব খুশি। হেমলতাকে ডেকে বললেন, 'এক মাসের লাইগগা ঘরটা ছাইড়া লাহাড়ি ঘরে উইঠঠা পড়।'
'কীসের দরকারের জন্য?'
'শুটিং করার লাইগগা মাতব্বর বাড়ির যারা আইছে, তারার বুলি আমরার বাড়ি পছন্দ অইছে। বিরাট অংকের টেকা দিব কইছে। আমিও কথা দিয়া আইছি। কাইলই উঠতে কইয়া আইছি।'

হেমলতা বিরক্ত হতে গিয়েও পারলেন না। সত্যি অর্থের খুব দরকার। পদ্মজার সামনে মেট্রিক পরীক্ষা। কত খরচ। কলেজে পড়াতে ঢাকা পাঠাতে হবে। তিনি মোর্শেদকে বললেন, 'টাকার ব্যাপারটা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে বলবা। নয়তো জায়গা হবে না।'
'আরে..বলামনে। এখন সব গুছাইয়ালাও ।'

পূর্ণা আড়াল থেকে সবটা শুনেছে। সাত দিন হয়েছে লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী এই গ্রামে এসেছে। অথচ, সে দেখতে পারল না। হেমলতা যেতে অনুমতি দেননি। পূর্ণা নামাযের দোয়ায় খুব অনুনয় করেছে আল্লাহকে। যেন লিখন শাহ আর চিত্রা দেবীকে স্বচক্ষে দেখতে পারে। আর এখন শুনলো, তাদের বাড়িতেই নাকি আসছে ওরা! পূর্ণার মনে হচ্ছে সে খুশিতে মরে যাচ্ছে।

_____
'এই মগা? আমাকে এক কাপ চা দাও তো।'

মগা ঝড়ের গতিতে চা নিয়ে আসে। লিখন চিত্রার পাশের চেয়ারটায় বসল। এরপর মগাকে বলল, 'দারুণ চা করো তো তুমি।'

মগা কাচুমাচু হয়ে হাসল। ভাবে বোঝা গেল, প্রশংসা শুনে সে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। চিত্রা মগার ভাবভঙ্গি দেখে হেসে উঠল। চিত্রা হাসলে মগা মুগ্ধ হয়ে দেখে। মাতব্বর বাড়ির কামলা সে। চিত্রনায়ক লিখন শাহ এবং চিত্র নায়িকা চিত্রা দেবীর সেবা করার দায়িত্ব মগাকে দেয়া হয়েছে। মগা এতে ভীষণ খুশি। চিত্রার সুন্দর মুখশ্রীর সামনে সবসময় থাকতে পারবে ভেবে। চিত্রা বলল, 'তোমার ভাইয়ের নাম জানি কী বলছিলে?'

চার ফুট উচ্চতার মগা উৎসাহ নিয়ে জবাব দিল, 'মদন।'

চিত্রার হাসি পায়। অনেক কষ্টে চেপে রাখল। মগা,মদন কারো নাম হয়?

শুটিংয়ের মাঝে হুট করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। তাই আপাতত শুটিং স্থগিত আছে। সবাই বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখছে। হাতে সবার রং চা । ডিরেক্টর আবুল জাহেদ দারুণ খিচুড়ি রান্না করেন। বৃষ্টি দেখেই তিনি রান্নাঘরে ঢুকেছেন।

' আচ্ছা, মগা এই বাড়ির দুইটা মেয়ে কোথায়? আসার পর একবার এসেছিল। এরপর তো আর এলো না।'
চিত্রা প্রশ্ন করল। মগা বলল, 'ওই যে লাহাড়ি ঘর। ওইডাত আছে।'
'লাহাড়ি ঘর মানে কি?'

মগার বদলে লিখন বলল, ' যে ঘরের অর্ধেক জুড়ে ধান রাখা হয়। আর অর্ধেক জায়গায় চৌকি থাকে কামলাদের জন্য ওই ঘরকে লাহাড়ি ঘর বলে এখানে। বোঝা গেছে?
চিত্রা চমৎকার করে হাসল।
' বোঝা গেছে। মগা, বৃষ্টি কমলে লাহাড়ি ঘরে যাব। ঠিক আছে?'
'আইচ্ছা আপা।'
'এই লিখন যাবা? ওইতো সামনেই। আলসেমি করো না।'
মগা হৈহৈ করে উঠল, 'না না, বেঠা লইয়া যাওন যাইত না। বাড়ির মালিকের মানা আছে। '
লিখন মগার না করার ভাব দেখে ভীষণ অবাক হলো। চিত্রা প্রশ্ন করল, 'মানা কেন?'

'বাড়ির বড় ছেড়িডারে তো আপনেরা দেহেন নাই। আগুন সুন্দরী। এই লিখন ভাইয়ের লাহান বিলাই চোখা। ছেড়িডারে স্কুল ছাড়া আর কোনোহানো যাইতে দেয় না। বাড়ি দিবার আগে কইয়া রাখছে লাহাড়ি ঘরে বেঠামানুষ না যাইতে। এই ছেড়ি লইয়া বহুত্তা কিচ্ছা আছে।'

চিত্রা বেশ কৌতুহল বোধ করল। লিখন তীক্ষ্ণ ঘোলা চোখে লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দেড় দিন হলো এখানে এসেছে। উঠানের শেষ মাথায় থাকা লাহাড়ি ঘরটা একবারো মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়নি।
সামনের দরজাটা বন্ধ। দুটো ছোট মেয়ে এসেছিল ঘরটার ডান পাশ দিয়ে। ঘরটার ডানে-বামে পিছনে গাছপালা। বাড়িটা পুরনো হলেও দারুণ। তবে এই মুহূর্তে তাঁর অন্যকিছুর প্রতি তীব্র কৌতূহল কাজ করছে।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৫

_____
লাহাড়ি ঘর দু'ভাগ করা হয়েছে চাদর টানিয়ে। একপাশের চৌকিতে হেমলতা এবং মোর্শেদ থাকেন। অন্যপাশের চৌকি পদ্মজা,পূর্ণা ও প্রেমার দখলে। লাহাড়ি ঘরের পিছনের দরজা আপাতত প্রধান দরজা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পিছনে অনেক কচু গাছ ছিল। হেমলতা মোর্শেদকে নিয়ে জায়গা খালি করেছেন। এরপর সেখানে মাটির চুলা তৈরি করা হয়েছে। বড় সড়কে উঠার জন্য ঝোপঝাড় কেটে সরু করে পথ করা হয়েছে। এতে মোর্শেদের সাহায্য ছিল না। হেমলতা দুই মেয়েকে নিয়ে একাই করেছেন। শুটিং দলে অনেক পুরুষ। পদ্মজাকে ভুলেও তাদের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করতে দেওয়া যাবে না । হেমলতার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, পদ্মজার মুখ পুড়িয়ে দিতে। পরক্ষণেই নিজের উপর ঘৃণা চলে আসে। কী করে নিজের মেয়ের প্রতি এমন মনোভাব আসতে পারে? অথচ,পদ্মজার হাতে সূচ ফুটলে হেমলতার মনে হয় নিজের শরীরে আঘাত লেগেছে। কী জন্য এতো টান পদ্মজার প্রতি? ভেতরে ভেতরে হেমলতা এই প্রশ্নের উত্তর জানেন। শুধু প্রকাশ পায় না। না জানার ভান ধরে থাকেন।

' আম্মা? আজ আমি রাঁধি?'

পদ্মজার প্রতিদিনের প্রশ্ন! হেমলতা রাঁধতে দিবেন না জানা সত্ত্বেও পদ্মজা প্রতিদিন অনুরোধ করে। হেমলতা বিপদ-আপদ ছাড়া পদ্মজাকে রান্নাঘরে পাঠান না। সোনার শরীরে মাটির চুলার কালি লাগাতে হেমলতার মায়া লাগে। তিনি হাসেন। পদ্মজা মুগ্ধ হয়ে দেখে। হেমলতার বয়স ছয়ত্রিশ। শ্যামলা চেহারা। দাঁতগুলো ধবধবে সাদা। চোখের মণি অন্যদের তুলনার বড় আর গাঢ় কালো। চোখ দুটিকে গভীর পুকুর মনে হয়। ছিমছাম গড়ন। পূর্ণা যেনো মায়েরই কিশোরী শরীর। তবে তারা তিন বোনই মায়ের মতো চিকন আর লম্বা।

'আচ্ছা,আজ তুই রাঁধবি।'
পদ্মজা ভাবেনি অনুমতি পাবে। আদুরে উল্লাসে প্রশ্ন করে, 'সত্যি আম্মা?'
'যা, জলদি। আছরের আজান কবে পড়েছে!'

পদ্মজা রান্নার প্রস্তুতি নিতে থাকে। পূর্ণা আর প্রেমা হিজল গাছের নিচে পাটি বিছিয়ে লুডু খেলছে। প্রেমা বাটপারি করে। এ নিয়ে কিছুকক্ষণ পর পর তাদের মাঝে তর্ক হচ্ছে। সকালে বৃষ্টি হয়েছে। রান্না করতে গিয়ে পদ্মজা ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ পেল। কী সুন্দর অনুভূতি!

মোর্শেদ পদ্মজাকে রাঁধতে দেখে কপাল কুঁচকে ফেললেন।
ঘরে ঢুকে হেমলতাকে মেজাজ দেখিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, 'এই ছেড়ি রাঁন্ধে ক্যান? '
হেমলতা নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন, 'আমি বলেছি।'
'কতদিন কইছি এই ছেড়ির হাতের রাঁন্ধন আমারে না খাওয়াইতে?'

মোর্শেদের কঠিন স্বর পদ্মজার কানে আসে। মুহূর্তে খুশিটুকু ফাটা বেলুনের মতো চুপসে যায়। সে জানে এখন ঝগড়া শুরু হবে। তার আম্মা, আব্বার অনুচিত কথাবার্তা মাটিতে পড়তে দেন না। তার আগেই জবাব ছুঁড়ে দেন।

'খেতে ইচ্ছে না হলে খাবা না। '
'রাইতবেলা না খাইয়া থাকবাম আমি?'
'খাবার রেখেও যদি না খেতে চাও সেটা তোমার সমস্যা। আমি বা আমার মেয়ে কেউই না করিনি। '

মোর্শেদ কিছু নোংরা কথা শোনাতে প্রস্তুত হোন। হেমলতা সেলাই মেশিন রেখে উঠে দাঁড়ান। তিনি যেন বুঝে গিয়েছেন মোর্শেদ কী বলবেন। আঙ্গুল তুলে শাসিয়ে মোর্শেদকে বললেন, 'একটা নোংরা কথা উচ্চারণ করলে আমি আজ তোমাকে ছাড়

দেব না। পদ্ম তোমার মেয়ে। আল্লাহ সইবে না। নিজের মেয়ে সম্পর্কে এতো নোংরা কথা কোনো বাবা বলে না।'

মোর্শেদ নোংরা কথাগুলো হজম করে নিলেন। তবে কিড়মিড় করে বললেন, 'পদ্ম আমার ছেড়ি না।'

'পদ্ম তোমার মেয়ে। আর,একটা কথাও না। বাড়িতে অনেক মানুষ। নিজের বিকৃত রূপ লুকিয়ে রাখ।'

মোর্শেদ দমে যান। চৌকিতে বসে বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়েন। চোখের দৃষ্টি অস্থির। পদ্মজার জন্মের পর থেকেই হেমলতার রূপ পাল্টে গেছে। কিছুতেই এই নারীর সাথে পারা যায় না। অথচ, একসময় কত মেরেছেন হেমলতাকে। হেমলতার পিঠে,উরুতে, ঘাড়ে এখনো মারের দাগ আছে। সময় কোন যাদুবলে হেমলতাকে পাল্টে দিল, জানা নেই মোর্শেদের।

_____

রাতের একটা শুট করে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। চিত্রা তখন কথায় কথায় জানাল, 'লাহাড়ি ঘরে গিয়েছিলাম। মগা যে মেয়েটার কথা বলেছিল তাকে দেখতে। '
চিত্রার কথায় লিখন আগ্রহ পেলো না। চিত্রা কখনো কোনো মেয়ের প্রশংসা করে না। খুঁত খোঁজে বের করতে ভালো জানে। নিজেকে খুঁতহীন সেরা সুন্দরী মনে করে।

'মেয়েটার নাম পদ্মজা।মগা, পুরো নাম জানি কী?'
চিত্রা মগার সাথে কথা বললে, মগা খুব লজ্জা পায়। এখনো পেল। লাজুক ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'উম্মে পদ্মজা।'
'ওহ হ্যাঁ। উম্মে পদ্মজা।'
চিত্রার পাশ থেকে সেলিনা পারভীন প্রশ্ন করলেন,'কী নিয়ে আলাপ হচ্ছে?'
সেলিনা পারভীন চলমান চলচ্চিত্রে চিত্রার মায়ের অভিনয় করছেন। চিত্রা বলল, 'এই বাড়ির মালিক যিনি উনার বড় মেয়ের কথা বলছি। এমন সুন্দর মুখ আমি দু'টি দেখিনি। মেয়েটার মুখ দেখলেই বুকের ভেতর নিকষিত, বিশুদ্ধ ভালো লাগার জন্ম হবে। এতো শ্রী ভগবান দিয়েছেন মেয়েটাকে।'

লিখন সহ উপস্থিত সবাই অবাক হলো। চিত্রার মুখে কোনো মেয়ের প্রশংসা! অবিশ্বাস্য! সবাইকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে চিত্রা বিব্রতবোধ করল। গলার জোর

বাড়িয়ে বলল, 'সত্যি বলছি! সন্ন্যাসী ছাড়া কোনো পুরুষ এই মেয়েকে উপেক্ষা করতে পারবে না।'

পদ্মজাকে নিয়ে বেশখানিকক্ষণ আলোচনা চলল। আগ্রহ বেশি লিখনের ছিল। যখন শুনলো পদ্মজার ষোল বছর সে দমে গেল। ছোট মেয়ে! হয়তো এমন বয়সী বেশিরভাগ মেয়েরা স্বামীর ঘরে থাকে। তবুও লিখনের পদ্মজাকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। তার একটা বোন আছে, ষোল বছরের। এখনো দুই বেণি করে স্কুলে যায়। কত ছোট দেখতে! লিখন আনমনে হেসে উঠল।

_____

হিজল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মজা। রাতের জোনাকি পোকা চারিদিকে। পদ্মজা প্রায় রাতে মুগ্ধ হয়ে দেখে জোনাকি পোকাদের। মনে হয় দল বেঁধে হারিকেন নিয়ে নাচছে তারা। তবে, এই মুহূর্তে রাতের এই সৌন্দর্য পদ্মজার মনে ঢুকতে পারছে না। পদ্মজা ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে। চোখ দু'টো জ্বলছে খুব। মোর্শেদ রান্না খারাপ হওয়ার অজুহাতে থালা ভর্তি ভাত,তরকারি ছুঁড়ে ফেলেছে পদ্মজার মুখে। চোখে ঝোল পড়েছে। তা নিয়ে হেমলতার সেকী রাগ! মোর্শেদ অবশ্য চুপ ছিলেন। তিনি তো রাগ মিটিয়েই ফেলেছেন। আর তর্ক করে কী হবে?

'পদ্ম?'
পদ্মজা তাকাল। হেমলতা ভেজা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'খুব জ্বলছেরে মা?'

পদ্মজা জবাব দিতে পারল না। ঠোঁট ভেঙে কেঁদে উঠল। মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই তার। মায়ের আদর ছাড়া কারো আদর পাওয়া হয়নি। সবাই তার দোষ খোঁজে। হেমলতার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোল। পদ্মজা ছিঁচকাঁদুনে। ছোট থেকেই কাঁদছে। তবুও জল ফুরোয় না। মন শক্ত হয় না। এমন হলে তো চলবে না! পদ্মজার কান্নার বেগ বাড়ল। হেমলতা সদ্য কাটা বড় গাছের বাকী অংশে বসলেন। চুপ করে পদ্মজার ফোঁপানো শুনছেন। পদ্মজা শান্ত হয়ে মায়ের পাশে বসল। তার মাথা নত। হেমলতা উদাস গলায় বললেন,'এভাবে চলবে না পদ্ম।

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা বললেন,'শোন পদ্ম, কেউ আঘাত করলে কাঁদতে নেই। কারণ মানুষ আঘাত করে কাঁদানোর জন্যই। আর যখন উদ্দেশ্য সফল হয় তখন তারা শান্তি পায়। যে আঘাত করল তাকে কেন শান্তি দিবি? শক্ত থাকবি। বুঝিয়ে দিবি তুই এতো দূর্বল নয়। যারে তারে পাত্তা দিস না। হাজার কষ্টেও কাঁদবি না। কান্না সাময়িক সময়ের জন্য মন হালকা করে। পুরোপুরি নয়। যে তোকে আঘাত করবে

তাকে তুই তোর চাল-চলন দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিবি। তখন তার মুখটা দেখে তোর যে শান্তিটা হবে সেটা কান্না করার পর হবে না। এই শান্তি স্থায়ী!'

হেমলতার কথা পদ্মজার উপর প্রভাব ফেলল না। সে করুণ স্বরে বলল, 'কিন্তু আব্বার ব্যবহার আমার সহ্য হয় না আম্মা। আমার সাথে কেন এমন করে আব্বা?'

'তাকে কখনো সামনাসামনি আব্বা ডাকার সুযোগ পেয়েছিস? পাসনি! তবুও কেন আব্বা, আব্বা করিস?
তাকে তুই পাত্তা দিবি না।'
'তুমি খুব কঠিন আম্মা।'
'তোকেও হতে হবে।'
'আব্বা কেন এমন করে আম্মা? আমিকি আব্বার মেয়ে না? আব্বা কেন বার বার বলেন, আমি তার মেয়ে না।'

হেমলতা চোখ সরিয়ে নেন। পদ্মজা জানে এই জবাব সে পাবে না। দাঁতে দাঁত চেপে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে। হেমলতা এক হাত পদ্মজার মাথায় রাখেন।
'কাঁদিস না আর। মায়ের রং না হয় পাসনি। মায়ের মতো শক্ত হওয়ার তো চেষ্টা করতেই পারিস।'
পদ্মজা নির্লজ্জ হয়ে আবার প্রশ্ন করল, 'আম্মা, আমি কি আব্বার মেয়ে না? বলো না আম্মা।'

পদ্মজার চোখ বেয়ে জল পড়ছে। খুব মায়া লাগছে হেমলতার। বুক ভারী হয়ে আসছে। তিনি আবেগ লুকিয়ে কণ্ঠ কঠিন করার চেষ্টা করলেন, 'মার খাবি পদ্ম। কতবার বলব, তুই আমার আর তোর আব্বার মেয়ে। '
'কি নাম আমার আব্বার?'

কী শান্ত কণ্ঠ পদ্মজার! হেমলতা চমকান তবে প্রকাশ করলেন না। মেয়েদের সামনে তিনি কখনো দূর্বল
হতে চান ন। পদ্মজার দিকে ঝুঁকে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বললেন, 'তোর আব্বার নাম মোর্শেদ মোড়ল।'

পদ্মজা হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মাকে খুব বিরক্ত লাগছে এখন। খুব কঠিন করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ' যাও এখান থেকে। আমার কাছে আর আসবা না। কখনো না। '

কিন্তু সে এমন ব্যবহার বাস্তবে কখনো পারবে না। কখনো না। রাতের বাতাসে ভেসে আসছে হাসনাহেনা ফুলের ঘ্রাণ। আকাশে থালার মতো চাঁদ। ঝিরিঝিরি মোলায়েম বাতাস চারিদিকে। পদ্মজার চোখের জল শুকিয়ে গেল। হেমলতা ঝিম মেরে বসে আছেন। একসময় নিস্তব্ধতা কাটিয়ে একটা অসহায় কণ্ঠ ভেসে আসল।
'মায়েরা তাদের জীবনের গোপন গল্প সন্তানদের বলতে পারে নারে পদ্ম।'

পদ্মজা তাকাল। হেমলতা ছলছল চোখে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজার কান্না পেল। মানুষটাকে এতো নরম রূপে মানায় না। পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল, 'আমি আর কখনো জানতে চাইব না আম্মা।'

শুটিং দলের একজনও বাড়িতে নেই। সবাই স্কুলে মাঠে গিয়েছে। কয়দিন ধরে নদীর ঘাটে যেতে না পেরে তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠেছে পদ্মজা। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। হেমলতার অনুমতি নিয়ে সে ঘাটে চলে আসল। ঘাটের সিঁড়িতে বসল। কয়েক সেকেন্ড পর টের পেল, গান বাজছে কোথাও। গানের সুর অনুসরণ করে কয়টা সিঁড়ি নেমে আসে। ঘাটের বাম পাশে বাঁধা নৌকায় একজন পুরুষ বসে আছে। হাতে রেডিও। গানের উৎস তাহলে এখানেই। পদ্মজা বিব্রতবোধ করল। উল্টো দিকে ঘুরে ব্যস্ত পায়ে লাহাড়ি ঘরে চলে আসে। পদ্মজা এতো দ্রুত ফিরাতে হেমলতা প্রশ্ন করেন, 'কেউ ছিল?'

পদ্মজা মাথা নাড়াল। হেমলতা চিন্তিত স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'কিছু বলেছে? দেখতে কেমন?'

' না আম্মা, কিছু বলেনি। আমাকে দেখেনি। মাথার চুল ঝাঁকড়া। মুখ খেয়াল করিনি।'

'এইটাই তো লিখন শাহ। নায়ক।'

পূর্ণা পুলকিত হয়ে বলল। হেমলতা আর কিছু বললেন না।

পূর্ণা সারাক্ষণ শুটিং দলটার আশেপাশে ঘুরঘুর করে। হেমলতা বিরক্ত হয়ে পূর্ণাকে কড়া নিষেধ দিয়েছেন, আর না যেতে। যদি যায় মার একটাও মাটিতে পড়বে না। পূর্ণা ভয় পেয়েছে। কিন্তু লিখন শাহ আর চিত্রা দেবী জুটিটা এতো ভাল লাগে তার যে শুটিং না দেখলে দম বন্ধ লাগে। তাই সে চুপিসারে টিনে একটা ছিদ্র করেছে।

Kobitor.com

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

হেমলতা সেলাই মেশিন লাহাড়ি ঘরের পিছন বারান্দায় রেখেছেন। সারাক্ষণ সেখানেই থাকেন। সে সেময় পূর্ণা ছিদ্র দিয়ে উঁকি দেয়। শুটিং দেখে। পূর্ণাকে সবসময় দেখতে দেখে পদ্মজার আগ্রহ জাগল। সে উঁকি দিল।

ঝাকড়া চুলের মানুষটা একজন অতি সুন্দরী মেয়েকে কোলে তুলে নিয়েছে। দৃষ্টি মোহময়। প্রেমময় গানের সুরধ্বনি বাড়ি জুড়ে। ক্যামেরা ধরে রেখেছেন কেউ কেউ। গানের শুটিং বোধহয়! পদ্মজা অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করল। লজ্জা পেল। চোখ সরিয়ে নিল।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৬

_____
রাতে ঝড় এসেছিল। লাহাড়ি ঘরের পিছনে তৈরি পথ বন্ধ হয়ে গেছে গাছের ভাঙা ডালপালা দিয়ে। মোর্শেদ রাতে বাড়ি ফেরেননি। হেমলতার একার পক্ষে সম্ভব নয় পথ খালি করার। তাই পদ্মজা, পূর্ণা স্কুল থেকে বাড়ির সামনে দিয়ে ফিরছিল। উঠোনে শুটিং দলের সবাই ছিল। পদ্মজা মাথা নত হয়ে থেমে থেমে কাঁপতে থাকে। পথ শেষই হচ্ছে না। মাথায় ঘোমটা টানা। অনেকের নজরে পদ্মজা চলে আসল। মিলন নামে একজন পূর্ণাকে ডাকল, 'এই পূর্ণা?'

পূর্ণা দাঁড়াল, সাথে পদ্মজা। পদ্মজা শুটিং দলটার দিকে তাকাচ্ছে না। মিলন পদ্মজার দিকে চোখ স্থির রেখে পূর্ণাকে প্রশ্ন করল, 'পাশের মেয়েটা কে? প্রথম দেখছি।'
'আমার বড় আপা।'
'আপন?'

মিলন ভারী আশ্চর্য হয়ে বলল। দশ দিন হলো এখানে আসার। কখনো পূর্ণা,প্রেমা ছাড়া কোনো মেয়েকে চোখে পড়ল না। কণ্ঠও শোনা যায়নি। তাই বড় বোন বলাতে সে খুব অবাক হলো। পূর্ণা হেসে বলল, 'হুম। আপন।'
মিলন বিড়বিড় করে বলল, 'চেহারার তো মিল নেই।'
'সবাই বলে।'
'আচ্ছা,যাও।'

দু'বোন লাহাড়ি ঘরে চলে আসল। পদ্মজা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভেতরটা এতো কাঁপছিল। অনেক মানুষের পা দেখেছে, চোখ তুলে মানুষগুলোর মুখ দেখার সাহস হয়নি। তবে, ইচ্ছে হয়েছিল চোখ তুলে তাকাতে!

_____

বিকেলে হাজেরা আসল। সবুর মিয়ার স্ত্রী। সবুর দিনরাত গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে। বউ - বাচ্চাদের খোঁজ রাখে না। হাজেরা এর বাড়ি ওর বাড়ি এটা-ওটা চেয়ে নেয়। এরপর দুই বাচ্চা নিয়ে খায়। পদ্মজার খুব মায়া হয় হাজেরার প্রতি। হাজেরা আসতেই হেমলতা পদ্মজার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'লাউ গাছে কয়টা লাউ দেখেছিস?'
'নয়টা আম্মা।'
'পূর্ণা কই? ওরে বল দুইটা লাউ হাজেরাকে দিয়ে দিতে। কাঁচামরিচও দিতে বলবি।'

পদ্মজার মুখে কালো আঁধার নেমে আসে। হেমলতা পদ্মজার মুখ দেখে বুঝতে পারেন, পূর্ণা বাড়িতে নেই।
'টিভি দেখতে গেছে তাই না?'
পদ্মজাকে দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা গেল। বিব্রতভাবে বলল,
'আম্মা, আমাকে ব..বলে গেছে।'
'তুই ওর অভিভাবক? একটু শরীরটা খারাপ লাগছে বলে শুয়েছি। ওমনি সুযোগ লুটে নিছে! '
'আম্মা, আমার দোষ। পূর্ণারে কিছু বলো না।'

পদ্মজার ভেজা কণ্ঠ হেমলতার রাগ উড়িয়ে দিল। তিনি অন্য দিকে মুখ করে শুয়ে বললেন, 'হাজেরারে নিয়ে যা। ঘোমটা টেনে যাবি। বেগুন বেশি হলে, কয়টা দিয়ে দিস।'

পদ্মজার মন ভরে গেল। তার মা এতো বেশি উদার! কখনো কাউকে ফিরিয়ে দেন না। সামর্থ্যের মধ্যে আরো বেশি কিছু দেওয়ার মতো থাকলে, তিনি কার্পণ্য করেন না। তবে, হাজেরার স্বভাব অভাবে নষ্ট হয়েছে। চুরি করার প্রবণতা আছে। তাই পদ্মজাকে যেতে বললেন।

উঠোনের এক কোণে এবং লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে লাউয়ের মাচা। নয়টা লাউ ঝুলে রয়েছে। তরতাজা টাটকা সবুজ পাতা নজর কাড়ে। পদ্মজা বাড়ির দিকে তাকাল না। একটা লাউ হাজেরার হাতে দিয়ে বলল,'কি দিয়ে রাঁধবা?'
'জানি না গো পদ্ম। গিয়া দেহি মাছ মিলানি যায়নি।'
'তোমার ছেলেটার ঠান্ডা কমছে?'

পদ্মজা কাঁচামরিচ ছিঁড়ে হাজেরার আঁচল ভরে দিল। হাজেরা গুনগুন করে কাঁদছে আর বলছে, 'ছেড়াডা সারাদিন মাডিত পইড়া থাহে একলা একলা। রাইত হইলে জ্বরে কাঁপে। দম ফালায়তে পারে না।'
'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'
'টেহা লাগব না? কই পামু?'
'তুমি,মাতব্বর বাড়িতে যেও। শুনছি, উনারা খুব দান-খয়রাত করেন।'

হাজেরা বাধ্যের মতো মাথা নাড়াল। বেগুন গাছ বাড়ির পিছনে। পদ্মজা বাড়ির পিছনে সাবধানে আসল। মনে মনে ভাবছে, হাজেরার ছেলে সুস্থই আছে। সকালে সে দেখেছে। হাজেরা মিথ্যা বলছে৷ মানুষের খুব অভাব পড়লে বুঝি এমনই হয়?

'এতো সবজি আছে। টমেটো নেই? পাওয়া যাবে?'

পরিষ্কার সহজ গলায় বলা পুরুষালী কণ্ঠটি পদ্মজাকে মৃদু কাঁপিয়ে তুলল। ঘুরে তাকাল। লিখনকে দেখে বিব্রত বোধ করল। কারো সামনে নিজের অস্বস্তি প্রকাশ করা উচিত না। কথাটি হেমলতা বলেছেন। পদ্মজা হাসার চেষ্টা করল। জবাব দিল,
'এই বর্ষাকালে টমেটো কোথায় পাবেন?'
'বর্ষাকালে টমেটো চাষ হয় না?'
'টমেটো শীতকালীন ফসল।'
'গ্রীষ্ম,বর্ষাতেও তো পাওয়া যায়।'

পদ্মজা অস্বস্তি লুকিয়ে রাখতে পারছে না। স্কুলের শিক্ষক আর খুব আপন মানুষগুলো ছাড়া কোনো পর-পুরুষের সাথে তার কখনো কথা হয়নি। লিখনের সাথে কথা বলতে গিয়ে তার জবান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে চুপচাপ বেগুন বুঝিয়ে দিল হাজেরাকে। লিখন বলল,
'আমি তো গতবার বর্ষাকালে টমেটোর সালাদ তৈরি করেছি।'
'হয়তো টমেটোর জাত আলাদা ছিল। সাধারণত আমাদের শীতকালেই টমেটো হয়।'

কথা শেষ করে দ্রুত লাহাড়ি ঘরে ফিরল সে। মনে হচ্ছে পর-পুরুষের সাথে কথা বলে ঘোর পাপ হয়ে গেছে।পাপ মোচন করতে হবে। ঘরে ঢুকে ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেল। হেমলতা ঘুমাচ্ছেন। নয়তো পদ্মজার মুখ দেখে নির্ঘাত বুঝে যেতেন, কিছু একটা ঘটেছে। পদ্মজা ভক্তি নিয়ে আল্লাহ তায়া'লার প্রতি শুকরিয়া আদায় করল।

_____

হেমলতা সালোয়ার-কামিজ সেলাই করছিলেন। তখন বারান্দার সামনে একজন পুরুষ লোক এসে দাঁড়াল।
হেমলতা শাড়ির আঁচল মাথায় টেনে নেন। জিজ্ঞাসুকদৃষ্টি নিয়ে তাকান। লোকটি হেসে বলল, 'আমি মিলন। শুটিং দলের। '

হেমলতা জোরপূর্বক হাসেন। আড়চোখে ঘরের দরজার দিকে তাকান। পদ্মজা ঘুমাচ্ছে।দরজাটা লাগানো উচিত।

'কোনো দরকার?'
'না,এমনি। দেখতে আসলাম। কতদিন হলো আপনাদের বাড়িতে উঠলাম। আর, এদিকটায়ই আসা হয়নি।'
হেমলতা প্যাঁচিয়ে কথা বলা পছন্দ করেন না। সরাসরি বলে উঠলেন, 'এদিকে আসা নিষেধ। আপনাদের বলা হয়নি?'

মিলনের চোখেমুখে ছায়া নেমে আসে। সে অপমান বোধ করল। আমতা আমতা করে বলল, ' ইয়ে...আচ্ছা, আসছি।'

মিলন স্থান ত্যাগ করল। যাওয়ার পূর্বের তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি হেমলতার নজর এড়াতে পারল না। হেমলতা চোখ বুজে জীবনের হিসেব কষেন। এরপর ঘুমন্ত পদ্মজার দিকে তাকান।

_____

পূর্ণার চেয়ে পদ্মজার বেশি আগ্রহ শুটিং দেখায়। টিনের ছিদ্র আরো দু'টো করেছে। লিখন শাহকে দেখলে তাঁর মায়াময়, কোমল অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির নাম সে জানে না। শুটিংয়ে লিখন শাহ কত ভালোবাসেন চিত্রা দেবীকে। পদ্মজার দেখতে খুব ভাল লাগে। পূর্ণা তেলের বোতল নিয়ে বলল, 'আপা, তেল দিয়ে দাও না।'
'সোনা বোন, একটু দাঁড়া।'

পদ্মজা ছিদ্র দিয়ে লিখন শাহর হাসি, কথা বলার ভঙ্গী দেখছে। লজ্জাও পাচ্ছে খুব। সময়টাকে থামিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।
'এই,আপা। পরেও তো দেখতে পারবা। দিয়ে দাও না।'
'আরেকটু। শুটিং শুরু হচ্ছে। একটু..."

পূর্ণার বিরক্তিতে রাগ হয় খুব। কিন্তু সে তার আপাকে কিছু বলবে না। তার সব ইচ্ছের সঙ্গী, সব গোপন কথার স্বাক্ষী তার আপা। সে তার আপাকে খুব ভালোবাসে। মাঝে মাঝে মনে হয়, মায়ের চেয়েও বেশি বোধহয় সে তার আপাকেই ভালোবাসে। বা হয়তো না। পদ্মজা মিটিমিটি হাসছে। পূর্ণা তেল রেখে ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিল। নাহ! তাঁর এখন ভাল লাগছে না এসব দেখতে। চোখ সরিয়ে নিল।

'কিরে পদ্ম? কী দেখছিস?'

হেমলতার কন্ঠ শুনে পদ্মজা চমকে উঠল। আরক্ত হয়ে উঠল। ডাকাতি করতে গিয়ে বাড়ির মালিকের কাছে ধরা পড়লে যেমন অনুভূতি হয় তেমন অনুভূতি হচ্ছে পদ্মজার। বা আরো ভয়ংকর অনুভূতি। হেমলতার দৃষ্টি টিনের ছিদ্রে গেল। সাথে সাথে পদ্মজা অনুভব করল, তাঁর পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে৷ পূর্ণা ভয়ার্ত চোখে একবার মাকে একবার বোনকে দেখছে। ছিদ্রের গুরু তো সে!

চলবে...
® ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৭
_____
হেমলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দুই মেয়েকে দেখেন। তিনটা ছিদ্র দেখেন। এরপর দৃষ্টি শীতল করে বললেন, 'শুটিং দেখছিলি?'
পদ্মজা বাধ্যের মতো মাথা ঝাঁকাল। হেমলতার রাগ হলো না। তিনি চৌকিতে বসে প্রশ্ন ছুঁড়লেন,'ছিদ্রের বুদ্ধি পূর্ণার?'

প্রশ্নটা শুনে পূর্ণার গলা শুকিয়ে আসল। এক ফোঁটা পানি দরকার। নয়তো দম বেরিয়ে যাবে। পদ্মজা চকিতে চোখ তুলে তাকাল। অসহায় কণ্ঠে বলল, 'আম্মা, আর হবে না। পূর্ণাকে কিছু বলো না। ওর দোষ নাই,আমি... "

হেমলতা পদ্মজাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। প্রেমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রেমা, তোর আব্বা কই?'
'উঠানে।'
'গিয়ে বল,আমি ডাকছি।'

প্রেমা ছুটে গেল। আবার ছুটে আসল। হেমলতা বারান্দা পার হয়ে চুলার দিকে এগোলেন। তখন মোর্শের আসলেন।
'কি হইছে? ডাক কেরে?'
'লাহাড়ি ঘরে একটা জানালা করে দাও। মেয়েদের চৌকির পাশে। কাঠ আছে মুরগির খোপের কাছে। '
'কী জন্যে?'
'আমি চাইছি, তাই। না পারলে বল। অন্য কাউকে ডাকব।'
'ত্যাড়া কথা কওন ছাড়।'
'আমার তোমার সাথে ভালো করে কথা বলতে ভালো লাগে না।'
'লাগব কেরে? তোমার তো আমারে পছন্দ না। তোমার পছন্দ বিলাই চোখা ব্যাঠা ছেড়ারে।'
'অহেতুক কথা বল না। মাসের পর মাস কোথায় থাকো তা আমার অজানা নয়। রোগে ধরলেই লতার কথা মনে পড়ে।'

মোর্শেদ মিনিট খানেক রাগ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

মোর্শেদ ঘন্টাখানেক সময় নিয়ে দুই ফুট উচ্চতার জানালা করলেন। পদ্মজা, পূর্ণা হতবাক। সেই সাথে খুশি। হেমলতা ছোট পর্দা টানিয়ে দেন। রুম থেকে বাহির দেখা যায়। কিন্তু জানালার ওপাশে কে আছে বাহির থেকে দেখা যায় না।
সন্ধ্যা মুহূর্তের শুটিং শুরু হয়। পদ্মজা,পূর্ণা, প্রেমা চৌকিতে বসল চিড়া নিয়ে। তাদের চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। হেমলতা তা দেখে মৃদু হাসলেন। বড় মেয়ে দুটো কখনো মুখ ফুটে শখ আহ্লাদের কথা বলে না। না বলা সত্ত্বেও অনেকবার দুই বোনের ইচ্ছে পূরণ করেছেন তিনি। আর কিছু ইচ্ছে বুঝতে পারলেও পূরণের সামর্থ্য হয়নি হেমলতার।

হেমলতা ঘরের বাইরে যেতেই পূর্ণা বলল, 'আমাদের মায়ের মতো সেরা মা আর কেউ না। তাই না আপা?'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

'মায়ের মতো কেউ হয় না। সবার কাছে সবার মা সেরা। আমাদের মা আমাদের কাছে সেরা। লাবণ্যর মা লাবণ্য আর ওর ভাইদের কাছে সেরা। মনির মা মনির কাছে সেরা।'
'ওরা বলছে?'
'বোকা! এসব বলতে হয় না।'
'না, আমাদের আম্মাই সবচেয়ে ভালো মা। এমন মা আর একটাও নেই।'

হেমলতার কানে প্রতিটি কথা আসে। পূর্ণা সবার অনুভূতি অনুভব করতে জানে না। পদ্মজা জানে।

'আমাদের আম্মা সত্যি সেরা। আলাদা। 'পদ্মজা হেসে বলল।
পূর্ণা জানালার বাইরে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'আপা, চিত্রা দিদিরে কেমন লাগে?'

পদ্মজা চিত্রার দিকে তাকাল। ছাইরঙা শাড়ি পরা। হাতে কালো রঙের ঘড়ি। ফুলহাতা ব্লাউজ। শালীন তবে সর্বাঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া। নাকে সাদা পাথরের নাকফুল। লম্বা চুল বেণি করে রেখেছে। মুখে খুব মায়া।স্নিগ্ধ একটা মুখ। যেন শরৎ-এর শুভ্র এক টুকরো মেঘ। পদ্মজা বলল, 'আমার দেখা দ্বিতীয় সুন্দর মেয়েমানুষ চিত্রা দিদি।'
পূর্ণা আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'প্রথম কে?'
পদ্মজা কণ্ঠ খাদে নামিয়ে মোহময় কণ্ঠে বলল, 'আমাদের আম্মা।'

হেমলতার বুক শীতল, স্নিগ্ধ, কোমল অনুভূতিতে ছেয়ে গেল। পদ্মজা এতো সুন্দর করে 'আমাদের আম্মা' বলেছে! হেমলতা প্রথম...এই প্রথম শুনলেন, তিনি সুন্দর! ভূবন মোহিনী রূপসীর মুখে শুনলেন। এই আনন্দ কোথায় রাখবেন তিনি। কেন ছেলেমানুষী অনুভূতিতে তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি! প্রেমা অবাক স্বরে বলল, ' আম্মা তো কালো। চিত্রা দিদির চেয়ে সুন্দর কীভাবে?'

'এভাবে বলছিস কেন প্রেমা? তুই ফর্সা হয়ে গেছিস বলে কালোকে ভালো মনে হয় না?'

পূর্ণা গমগম করে উঠল। প্রেমা ভয় পেল। পদ্মজা বলল, 'পূর্ণা, বকছিস কেন? প্রেমা কত ছোট। ও কী সুন্দরের গভীরতা বুঝে? ও খালি চোখে ফর্সা, কালোর তফাৎ দেখে।'
'সুন্দরের গভীরতা তো আমিও বুঝি না।'

পূর্ণার কণ্ঠ ভারী নিষ্পাপ শোনাল। পদ্মজা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল হেমলতার উপস্থিতি। এরপর বলল, 'আম্মার রং কালো। কিন্তু সৌন্দর্যের কমতি নেই। আম্মাকে কখনো এক মনে দেখিস,বুঝবি। আমাদের আম্মার চোখ দুটি গভীর,বড়,বড়। পাতলা,মসৃণ ঠোঁট। আম্মার ঘন চুলের খোঁপায় এক আকাশ কালো মেঘ। আম্মার শাড়ির কুচির ভাজে আভিজাত্য লুকোনো। আম্মা যখন তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের দিকে তাকান, তখন মনে হয়, বিরাট বড় রাজত্বের রানী তাঁর পূর্বপুরুষের ক্ষমতা প্রকাশ করছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। এতকিছু থাকা সত্ত্বেও ও কী আম্মা আমাদের দেখা প্রথম সুন্দর মানুষ হতে পারেন না?'

পদ্মজার প্রতিটি কথা পূর্ণার উপর ভীষণ ভাবে প্রভাব ফেলল। প্রেমা চোখ পিটপিট করে কিছু ভাবছে। পূর্ণা বলল, 'হতে পারে। কাল থেকে আমি আম্মাকে দেখব মন দিয়ে। '
'আমিও।' প্রেমা পূর্ণার দলে ঢুকল।

হেমলতার চোখ বেয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। এই কালো রঙের জন্য ছোট থেকে সমাজে তুচ্ছতাচ্ছিল্য হয়ে এসেছেন। কত লুকিয়ে কাঁদা হয়েছে। কত করে চাওয়া হয়েছে, কেউ সুন্দর বলুক। কিন্তু সেই কপাল কখনো হয়নি। আর আজ, এই বয়সে এসে শুনলেন, তিনি কুৎসিত নন। তার মাঝেও সৌন্দর্য আছে। জন্মদাত্রী মা কালো রঙের জন্য গরম চামচ দিয়ে পোড়া দাগ করেছিলেন ঘাড়ে। আর গর্ভের সন্তান আজ সেই অনুচিত কাজের জবাব দিল। আল্লাহর সৃষ্টি কেউ অসুন্দর নয়। সবার মধ্যেই সৌন্দর্য আছে। যা ধরা পড়ে শুধুমাত্র সুন্দর একজোড়া চোখে।

_____
নিশুতি রাত। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। হেমলতা চোখ খুলেন। হুট করে ঘুমটা ভেঙে গেল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ইঙ্গিত করছে কোনো ষড়যন্ত্রের। লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ। হেমলতার বুক কেঁপে উঠল। তিনি দ্রুত উঠে বসেন। দুই চৌকির মাঝের পর্দা সরিয়ে দেখেন পদ্মজার অবস্থান। পদ্মজাকে ঘুমাতে দেখে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাস ছাড়েন। পায়ের আওয়াজ একদম পাশে শোনা যাচ্ছে। হেমলতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ডান পাশে তাকান। গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবুও তিনি তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে, অদৃশ্য গোপন শত্রুকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

'কে ওখানে?'

Kobitor.com গল্পের ওয়েবসাইট,

হেমলতার ঝাঁঝালো কণ্ঠে পায়ের আওয়াজ থেমে গেল। সেকেন্ড কয়েক পর দুই'জোড়া পা যেন ছুটে পালাল।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ৮

_____

আলো ফোটার পূর্বে নিদ্রা ত্যাগ করে চার মা-মেয়ে একসাথে নামায পড়ল। এরপর বারান্দায় শীতল পাটি বিছিয়ে তিন বোন পড়তে বসল। রাতভর ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে৷ বর্ষা স্নানে স্নিগ্ধ প্রকৃতি। মায়াবী সকাল। এমন সকালে কেউ ঘুমাতে চায়। আর কেউ বা বই পড়তে পছন্দ করে। অথবা,পছন্দের অন্য যেকোনো কাজ করে। পূর্ণার ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। পড়া একদমই সহ্য হচ্ছে না। পড়া থেকে উঠেই সে মনোবাসনা পূর্ণ করতে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। সাথে সাথে ঘুমে হারাল। পদ্মজা অনেক ডাকল, উঠল না। এদিকে স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। হেমলতা বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পূর্ণা ঘুমে?'
'জ্বি,আম্মা।'
'সে জানে না স্কুল আছে। তবুও কোন আক্কেলে ঘুমাল।'
মায়ের কঠিন স্বরে পদ্মজা ভয় পেল। পূর্ণা নির্ঘাত মার খাবে আজ। সে হেমলতাকে আশ্বস্ত করে বলল, 'তুমি যাও আম্মা। পূর্ণা কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।'

হেমলতা জানেন, পূর্ণা এতো সহজে ঘুম থেকে উঠবে না। অহরহ এমন হয়ে আসছে। যতই আদর করে ডাকা হোক না কেন, বৃষ্টিমাখা সকালে তার ঘুম ছুটানো যায় না। বাঁশের কঞ্চি পূর্ণা খুব ভয় পায়। কঞ্চির বারি না খাওয়া অবধি ঘুম পূর্ণাকে কিছুতেই ছাড়বে না। এ যেন ভূত ছাড়ানোর মতো। হেমলতা বাঁশের কঞ্চি আনতে যান। এদিকে পদ্মজা ডেকেই যাচ্ছে, 'পূর্ণা? উঠ। মারটা খাওয়ার আগে উঠ। এই পূর্ণা। পূর্ণারে...পূর্ণা উঠ। '

পূর্ণা পিটপিট করে চোখ খুলে আবার ঘুমিয়ে যাচ্ছে। প্রেমা এই ব্যাপারটা খুব উপভোগ করে। একটা মানুষ এতো ডাকাডাকিতেও কী করে না জেগে থাকতে পারে?

সে নিষকম্প স্থির চোখে তাকিয়ে আছে বড় দুই বোনের দিকে। হেমলতা হাতে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে ঘরে ঢুকেন। তা দেখে পদ্মজা পূর্ণাকে জোরে চিমটি দিল। পূর্ণা মুখে বিরক্তিকর আওয়াজ তুলে আবার ঘুমে তলিয়ে গেল।

'তুই সর পদ্ম। ও মারের যোগ্য। পিটিয়ে ওর ঘুম ছুটাতে হবে।'

পদ্মজা মায়ের উপর কিছু বলার সাহস পেল না। দূরে গিয়ে দাঁড়াল। হেমলতা পূর্ণার পায়ের গোড়ালিতে বারি দেন। প্যাঁচ করে আওয়াজ হয়। পদ্মজা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। পা ছিঁড়ে গেছে বোধহয়। ঘুমন্ত পূর্ণার মস্তিষ্ক জানান দেয়, আম্মা এসেছেন। এবং তিনি আঘাত করেছেন। সে চোখ খোলার আগে দ্রুত উঠে বসল। চোখ খুলতে খুলতে যদি দেরি হয়ে যায়! এরপর চোখ খুলল। বোকাসোকা মুখ করে মায়ের দিকে তাকাল পরিস্থিতি বুঝতে। পদ্মজা ঠোঁট টিপে হাসছে। প্রেমা জোরে হেসে উঠল। হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই হাসি থামিয়ে দিল। পূর্ণা ভীতু কণ্ঠে বলল, 'আর হবে না আম্মা।'
'সে তো, প্রতিদিনই বলিস।'
এমন সময় ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। পূর্ণা, প্রেমা মনে মনে খুশি হলো। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। বাড়ি থেকে দুই ক্রোশ দূরে স্কুল। আম্মা নিশ্চয় যেতে না করবেন। পূর্ণা খুশি লুকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আম্মা, মেঘ আসবে মনে হয়। যাবো স্কুলে?'
'মেঘ কী করল তোকে? যাবি স্কুলে।'

হেমলতা চলে যেতেই পূর্ণা ভ্রুকুঞ্চন করল। থম মেরে বসে রইল। পদ্মজা তাড়া দিল, 'বসে আছিস কেন? জলদি কর। নয়তো আবার পিটানি খাবি।'

পূর্ণা বিরক্তি নিয়ে তৈরি হলো। তিন বোন স্কুলের দিকে রওনা দিল। বর্ষাকাল চলছে। রাতে বিরতিহীনভাবে বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় প্রচুর কাঁদা জমেছে। পথ চলা কষ্টকর। তিন বোন হাতে জুতা নিয়ে পা টিপে হাঁটছে। পিছলে পড়ে বই খাতা নষ্ট করার ভয় কাজ করছে মনে। অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। পদ্মজা পথের পাশ থেকে বড় কচু পাতা ছিঁড়ে নিল তিনটা।

তিন বোন কচু পাতায় মাথা আড়াল করল। কিন্তু দেহ ও বই-খাতা আড়াল করা গেল না। ভিজে একাকার হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণা বিরক্তি প্রকাশ করল, 'ধ্যাত! ভিজে স্কুলে গিয়ে লাভ কী আপা? দেখ,পায়জামা হাঁটু অবধি কাঁদায় আর বৃষ্টির পানি দিয়ে কী হয়েছে।'

পদ্মজা চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'বুঝতে পারছিনা কী করব! স্কুলে যাব? নাকি বাড়ি ফিরব।'
'আপা, বাড়ি যাই।'
বলল প্রেমা। পদ্মজা ভাবল। এরপর দু'বোনকে বলল, 'ভিজে তো কতবারই গেলাম। আজও যাই। সমস্যা কী?'

অগত্যা স্কুলেই যেতে হলো। স্কুল ছুটির আগেও বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি। তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাড়ি ফেরার পথ ধরল দুই বোন। প্রেমার এক ঘন্টা আগে ছুটি হয়েছে। পদ্মজা নীচু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'আব্বা আসছিল স্কুলে?'
'হ আসছিল। প্রেমারে নিয়ে গেছে।'
'তোর সাথেও তো দেখা করল।'

পদ্মজার গলাটা করুণ শোনাল। পূর্ণার মন খারাপ হয়। আব্বা কেন তার এতো ভাল আপাকে ভালোবাসেন না?
'পূর্ণা, পড়ে যাবি। সাবধানে হাঁট।'

পদ্মজা সাবধান বাণী দিতে দিতে পূর্ণা ধপাস করে কাঁদা মাটিতে পড়ল। পদ্মজা আঁতকে উঠল। পূর্ণার পা নিমিষে ব্যাথায় টনটন করে উঠে। পদ্মজা পূর্ণাকে তোলার চেষ্টা করে। পদ্মজাকে আঁকড়ে ধরেও উঠতে পারছে না পূর্ণা। কাঁদো কাঁদো হয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আপা, পা ভেঙে গেল মনে হয়। কী ব্যথা করছে।'

'মচকেছে বোধহয়। ঠিক হয়ে যাবে। উঠার চেষ্টা কর। আমার গলা ধরে চেষ্টা কর।'

গ্রামের পথ। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। পথে কেউ নেই। গৃহস্থরা ভাত ঘুম দিয়েছে। সামনে বিলে থইথই জল। তার পাশে ক্ষেত। ডানে-বামে কাঁদামাটির পথ। পিছনে ঝোপঝাড়। পদ্মজা সাহায্য করার মতো আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। পূর্ণা পা সোজা করার শক্তি পাচ্ছে না। পায়ে প্রচন্ড ব্যথা! ঠোঁট কামড়ে কাঁদছে সে। পদ্মজা না পারছে পূর্ণাকে তুলতে আর না পারছে পূর্ণার কান্না সহ্য করতে। সে মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। পদ্মজার উৎসাহে পূর্ণা মনকে শক্ত করে পায়ের পাতা মাটিতে ফেলল। সাথে সাথে শরীরে ব্যথার বিজলি চমকাল।

'আপারে, পারছি না। আমার পা শেষ। মরে যাব আমি।'
'এসব বলিস না। পায়ের ব্যথায় কেউ মরে না।'

Kobitor.com

আহত পা ফুলে দুই ইঞ্চি উঁচু হয়ে গেছে। তা দেখে আতঙ্কে পদ্মজার চোখ মুখ নীল হয়ে গেল। তার কান্না পাচ্ছে খুব। পদ্মজা পূর্ণার পায়ে আলতো করে চাপ দিতেই পূর্ণা চেঁচিয়ে উঠল।

'একটু সাবধানে হাঁটলে কী হতো? ইশ, এখন কী কষ্টটা হচ্ছে৷'
'আপা, পা ব্যথা খেয়ে নিচ্ছে।'

পদ্মজা খুব কাছে পায়ের শব্দ পেল। চকিতে চোখ তুলে ক্ষেতের দিকে তাকাল। মুহূর্তে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সে পূর্ণাকে বলল, 'পূর্ণারে, আম্মা আসছে।'

হেমলতাকে দেখে পূর্ণা কলিজায় পানি পেল। মনে হলো, মাকে দেখেই ব্যথা অনেকটা কমে গেছে। হেমলতা ছুটে আসেন। পূর্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'কিছু হয়নি। এসব সামান্য ব্যাপার।'
এরপর পদ্মজাকে বললেন, 'তুই বইগুলো নে।'

হেমলতা এদিকে সেলাই করা কাপড় দিতে এসেছিলেন। যার কাপড় ছিল, সে অসুস্থ। তাই যেতে পারছিল না।
বাড়িতেও কোনো কাজে মন টিকছিল না। তাই ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ঘরে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে একটা মানুষকে সাহায্য করা ভালো। ফেরার পথে তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন দুটো মেয়েকে। একটা মেয়ে পথে বসে আছে। আরেকটা মেয়ে পাশে। বিপর্যস্ত অবস্থা তাদের। মেয়ে দু'টিকে চিনতে পেরে বুক কেঁপে উঠল। পথ দিয়ে আসলে দেরি হবে। তাই তিনি ক্ষেতের পথ ধরেন।

পূর্ণা ব্যথায় যেন নিঃশ্বাস নেয়ার শক্তি পাচ্ছে না। একটা ভ্যান পাওয়া গেলে খুব উপকার হতো। দুই মিনিটের মাথায় ভ্যানের দেখা মিলল। অনেক দূরে ভ্যানের অবস্থান। ভ্যানে চিত্রা, লিখন সহ আরো দুজন।
তারা মাতব্বর বাড়িতে গিয়েছিল। যখন কাছাকাছি ভ্যানের অবস্থান তখন চিত্রা পদ্মজা আর তার মা, বোনকে দেখল। উদ্বিগ্নতা নিয়ে ভ্যান থামাতে বলল। লিখনের নজরে ব্যাপারটা আসতেই সে তাড়াহুড়ো করে ভ্যান থেকে নামল। চিত্রা আগে আগে এগিয়ে আসে। চোখে মুখে আতঙ্ক নিয়ে বলল, 'পূর্ণার কী হয়েছে ?'

পদ্মজা বলল, 'কাঁদায় পড়ে পা মচকেছে।'

হেমলতা, চিত্রা,পদ্মজা এবং পূর্ণাকে তুলে দিয়ে লিখন সহ বাকি দুজন সহকর্মী ভ্যান ছেড়ে দিল। তারা হেঁটে ফিরবে।

পা ব্যথা অনেকটা কম লাগছে। দুটি বালিশের উপর পা রাখা। ব্রেস নেই বিধায় ব্রেসের মতো কাপড় বেঁধে দিয়েছেন হেমলতা। যা ব্যাথা পেয়েছে কয়দিন বোধহয় স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে না। হেমলতা মুখে তুলে খাইয়ে দিলেন। এরপর বললেন, 'এবার খুশি? স্কুলে যেতে হবে না। কাজ করতে হবে না। সকালে উঠে পড়তে বসতে হবে না।'

পূর্ণা রাজ্যের দুঃখ নিয়ে বলল, 'সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমি টিভি দেখতে যাব কী করে?'

কোনো সাড়া না পেয়ে পূর্ণা বুঝতে পারল, সে মুখ ফসকে ভুল জায়গায় ভুল কথা বলে ফেলেছে। সে বিব্রত হয়ে উঠল। ঢোক গিলল। এরপর কাঁচুমাচু হয়ে মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'মোটেও খুশি হইনি।'

বিকেলে মগা এসে জানাল, মুন্নার বাপ খুন হয়েছে। কথাটি শোনার সাথে সাথে উপস্থিত সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়ল। পঙ্গু, ভিক্ষুক অসহায় মানুষটাকে কে মারল? এমন মানুষের শত্রু থাকে? এমনই শত্রু যে, একদম মেরে ফেলল।
হেমলতা শ্বাসরুদ্ধকর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়লেন 'কখন?'
মগা বলল, দুপুরের কথা। দুপুর দুটো কি তিনটায় গ্রামবাসী জানতে পারে এই ঘটনা। আস্তে আস্তে সব গ্রামে খবর যাচ্ছে। লাশ নোয়াপাড়ার ধান ক্ষেতে পাওয়া গেছে।

মুন্নার আত্মীয় বলতে কেউ নেই। দুঃসম্পর্কের যারা আছে তারা মুন্নার দায়িত্ব নিতে চাইল না। মাতব্বর মুন্নার ভার নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুন্না পদ্মজাদের বাড়ি থাকতে চায়। হেমলতা সানন্দে নিয়ে আসলেন মুন্নাকে।
এখন থেকে মুন্না এই বাড়ির ছেলে। পদ্মজা, পূর্ণা খুব খুশি হলো। খুশি হলো না প্রেমা। মুন্না, প্রেমা সমবয়সী। প্রেমা ভাবছে, তার আদরের ভাগ বসাতে মুন্না এসেছে।
হেমলতা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। পদ্মজাকে বললেন, 'প্রেমার পছন্দ হচ্ছে না মুন্নাকে। দুজনের মধ্যে সখ্যতা করে দিস। যাতে একজন আরেকজনকে আপন চোখে দেখে।'
পদ্মজা আশ্বস্ত করে বলল,'কয়দিনে মিশে যাবে দুজন।'

পূর্ণা ব্যথায় ঘুমাতে পারছে না। প্রেমা, মুন্না ঘুমে। মুন্না খুব কেঁদেছে। এখন ক্লান্ত হয়ে বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। রাত তো কম হলো না। পূর্ণা মা-বোনের বৈঠক দেখে বলল,
'আম্মা, মুন্নার নতুন নাম রাখা উচিৎ। '
'কেন?'
'এখন থেকে মুন্না আমাদের ভাই। আমাদের নাম প দিয়ে। তাইলে ওর নাম ও প দিয়ে হবে। তাই না আপা?'
হেমলতা হেসে বলেন,'তুই নাম রাখ তাহলে।'
'রাখছি তো। প্রান্ত মোড়ল।'
'মুন্নাকে জানা সকালে। রাজি হলে এরপর সবাই নাহয় ডাকব।'
'রাজি হবে না মানে? পিটিয়ে রাজি করাব।'

হেমলতা মৃদু হাসলেন। পূর্ণা অসুস্থ হলে খুব কথা বলে। মুখ বন্ধ রাখতেই পারে না। অনেক বছর আগের ঘটনা, বা কয়েক বছর পর কি হবে তা নিয়ে অনবরত কথা বলতে থাকে।

_____
গহীন অন্ধকার। আজ বোধহয় অমাবস্যা। হেমলতা কালো চাদরের আবরণে ঘাপটি মেরে বারান্দায় বসে আছেন। হাতের কাছে ছুরি,লাঠি। গত তিন'দিন ধরে তিনি ঘরের পাশে পায়ের আওয়াজ শুনছেন। তখন ঘরে মোর্শেদ ছিল। একজন পুরুষ ছিল। বুকে সাহস ছিল। আজ মোর্শেদ নেই। মুন্নাকে বাড়িতে আনাতে তিনি ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছেন। কবে ফিরবেন ঠিক নেই! আজ কিছুতেই ঘুমানো যাবে না। হাতেনাতে সন্দেহকারীকে ধরে এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হলো কেউ আসছে না। চোখ বুজে আসছে হেমলতার। সারাদিন অনেক খাটুনি গেল।

কাঁদামাটিতে ছপছপ শব্দ তুলে কেউ আসছে। হেমলতা সতর্ক হয়ে উঠেন। শক্ত হাতে লাঠি ও ছুরি ধরেন। পায়ের শব্দটা কাছে আসতেই তিনি বেরিয়ে আসেন। অন্ধকারে পরিষ্কার নয় মুখ। আন্দাজে ছুঁড়ে মারেন হাতের লাঠি। লাঠিটা বেশ ভাল ভাবেই পড়ল সামনের জনের উপর। পিছনের জন দৌড়ে পালাল। লোকটি আর্তনাদ করে বসে পড়ল মাটিতে। পরক্ষণেই পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না হেমলতার জন্য। হেমলতা দ্বিতীয় লাঠি দ্বারা আবার আঘাত করলেন। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির।

আহত ব্যক্তির আর্তচিৎকার শুনে বাড়ির ভেতর থেকে ছুটে আসে সবাই। টর্চের আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। হেমলতা স্বাভাবিক ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। তিনি যেন জানতেন এই লোকেরই আসার কথা ছিল। শুটিং দলকে তিনি আজই বের করবেন। তবেই শান্তি!পদ্মজা, প্রেমা, মুন্না বেরিয়ে আসে। পূর্ণা ঘরেই রইল। পদ্মজা ডিরেক্টর আবুল জাহেদকে দেখে চমকাল! তখন কোথেকে আগমন ঘটলো মোর্শেদের!

চলবে... ®ইলমা বেহরোজ
আমি পদ্মজা - ৯

_____

আবুল জাহেদকে আহত অবস্থায় দেখে সবাই চমকে উঠল। কপাল বেয়ে তার রক্ত ঝরছে। একজন দৌড়ে গেল বাড়ির ভেতর ফার্স্ট এইড বক্স আনতে। লিখন কিছু সময়ের জন্য থমকাল। আবুল জাহেদের কপাল ব্যান্ডেজ করার পর তাকে একটা চেয়ারে বসতে দেয়া হলো। হেমলতা লাঠিতে এক হাতের ভর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। লিখন প্রশ্ন করল,' কী হয়েছিল? আপনি উনাকে আঘাত করলেন কেন?'

হেমলতা বললেন, 'এই অসভ্য লোক আজ চারদিন ধরে মাঝরাতে এখানে ঘুরঘুর করে। তার উদ্দেশ্য খারাপ।'

লিখন আড়চোখে পদ্মজাকে দেখল। এরপর আবুল জাহেদকে প্রশ্ন করল, ' উনি যা বলছেন,সত্যি?'

আবুল জাহেদ গমগম করে উঠল, 'আমি আজই প্রথম এসেছি এখানে। ঘুম আসছে না। তাই হাঁটতে হাঁটতে এদিক চলে এসেছি। হুট করেই উনি আক্রমণ করে বসলেন।'

হেমলতা প্রতিবাদ করেন দৃঢ় স্বরে, ' মিথ্যে বলবেন না একদম।'

আবুল জাহেদ কিছুতেই তার উদ্দেশ্য স্বীকার করল না। তর্কেতর্কে ভোরের আলো ফুটল। হেমলতা কঠিন করে জানিয়ে দিয়েছেন আজই এই বাড়ি ছাড়তে হবে। হেমলতার সিদ্ধান্ত শুনে দলটির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তীরে এসে নৌকা ডুবতে কীভাবে দেয়া যায়? সিনেমার শেষ অংশটুকু বাকি। শর্ত অনুযায়ী আরো দশদিন আছে। দলের একজন বয়স্ক অভিনেতা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে হেমলতা জবাব দিলেন, 'আমার তিনটা মেয়ের নিরাপত্তা দিতে পারবেন? একটা পুরুষ মানুষ রাতের আঁধারে যুবতী মেয়েদের ঘরের পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করবে কেন? কীসের ভিত্তিতে?'

হেমলতা সবাইকে এড়িয়ে লাহাড়ি ঘরে ঢুকেন। এদের সাথে তর্ক করে শুধু সময়ই নষ্ট হবে। আবুল জাহেদের ধূর্ত চাহনি তার নজরে এসেছে বারংবার। প্রথম রাতে পায়ের আওয়াজ শুনে চিনতে পারেননি। এরপরদিন, সন্দেহ তালিকায় থাকা চার-পাঁচ জনকে অনুসরণ করে তিনি নিশ্চিত হোন, রাতে কে লাহাড়ি ঘরের পাশে হেঁটেছিল। লাহাড়ি ঘরের ডান পাশে তুষের স্তূপ। পলিথিন কাগজ দিয়ে ঢাকা। অসাবধান বশে আবুল জাহেদের কাঁদা মাখা জুতা তুষের স্তূপে পড়ে। ফলে জুতায় তুষ লেগে যায়। এরপরদিন হেমলতা বাড়ির বারান্দায় জুতাজোড়া দেখতে পান। তুষ বাড়ির আর কোথাও নেই। তিনি ব্যস্ত হয়ে তুষের স্তূপের কাছে এসে দেখেন, এক জোড়া জুতার চাপ। সেই জুতা যখন আবুল জাহেদ পরল তিনি পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হোন।

শুটিং দলটার মধ্যে একটা হাহাকার লেগে গেল। বেশ কিছুকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলল। এরপর সবাই মোর্শেদকে ধরল। বিনিময়ে তারা আরো টাকা দিতে রাজি। হেমলতার ধমকের ভারে তখন চুপ হয়ে গেলেও টাকার কথা শুনে মোর্শেদের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে উঠল। ঘরে এসে হেমলতার সাথে ধুন্ধুমার ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন। হেমলতা কিছুতেই রাজি হননি। শেষ অবধি তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারলেন না। দলের কিছু ভাল মানুষের অনুরোধ ফেলতে গিয়ে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। দশদিনের বদলে পাঁচ দিনের সময় দেন। হেমলতা স্বস্থিতে নিঃশ্বাস ফেলেন। ভাগ্যিস কোনো ঘটনা ঘটার আগে ব্যাপারটা খোলাসা হয়েছে।

বেশ গরম পড়েছে আজ। মুন্নাকে পাশে নিয়ে পদ্মজা পাটিতে বসে আছে। মনোযোগ দিয়ে মুন্নাকে শিখাচ্ছে, কাকে কী ডাকতে হবে।

'আমায় ডাকবি, বড় আপা। পূর্ণাকে ছোট আপা। আর প্রেমাতো তোর সমান। তাই প্রেমা ডাকবি। দুজন মিলেমিশে থাকবি। বুঝেছিস?'
'হ, বুঝছি।'
'আম্মাকে তুইও আম্মা ডাকবি। আমাদের আম্মা,আব্বা আজ থেকে তোরও আম্মা,আব্বা। বুঝছিস?'
মুন্না বিজ্ঞ স্বরে বলল, 'হ, বুঝছি।'
হেমলতা রান্না রেখে উঠে আসেন। মুন্নাকে বলেন, 'শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবি। তোর পদ্ম আপা যেভাবে বলে।'

'কইয়ামনে।'
পদ্মজা বলল, 'কইয়ামনে না। বল, আচ্ছা বলব।'
মুন্না বাধ্যের মতো হেসে বলে, 'আচ্ছা, বলব।'
হেমলতা হেসে চলে যান। পূর্ণা রুম থেকে মুন্নাকে ডাকল,'মুন্নারে?'
'হ,ছুড়ু আপা।'
পদ্মজা মুন্নার গালে আলতো করে থাপ্পড় দিয়ে বলল, 'বল, জি ছোট আপা।'
মুন্না পদ্মজার মতো করেই বলল, 'জি, ছোট আপা।'
পদ্মজা হাসল। পূর্ণা মৃদু হেসে বলল, 'তোর নাম পাল্টাতে হবে। আমি তোর নতুন নাম রেখেছি।'
'কেরে? নাম পাল্ডাইতাম কেরে?'
পদ্মজা কিছু বলার আগে মুন্না প্রশ্ন করল, 'আইচ্ছা এই কথাডা কেমনে কইতাম?'

পদ্মজা হেসে কপাল চাপড়ে। এই ছেলে তো আঞ্চলিক ভাষায় বুঁদ হয়ে আছে। পূর্ণা বলল, 'তুই এখন আমাদের ভাই। আমাদের নামের সাথে মিলিয়ে তোর নাম রাখা উচিত। কি উচিত না?'
মুন্না দাঁত কেলিয়ে হেসে সায় দিল, 'হ।'
'এজন্যই তোর নাম পাল্টাতে হবে। আজ থেকে তোর নাম প্রান্ত মোড়ল। সবাইকে বলবি এটা। মনে থাকবে?'
'হ, মনে রাহাম।'
'বল, আচ্ছা মনে রাখব।'
'আচ্ছা, মনে রাখব।'

দুপুর গড়াতেই হাজেরা আসল। সাথে নিয়ে এসেছে বানোয়াট গল্প আর বিলাপ। ইশারা, ইঙ্গিতে সে লাউ চাইছে। মোর্শেদ গতকাল সব লাউ বাজারে তুলেছেন। গাছে আর একটা ছিল। ঘরে চিংড়ি মাছ আছে। প্রান্ত লাউ দিয়ে চিংড়ি খাবে বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।
হেমলতা হাসিমুখে শেষ লাউটা নিয়ে এসেছেন। এখন আবার হাজেরারও চাই। কেউ কিছু চাইলে হাতে থাকা সত্ত্বেও হেমলতা ফিরিয়ে দেননি। আজও দিলেন না। তিনি হাজেরাকে হাসিমুখে লাউ দিলেন। হাজেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে চলে গেল। পদ্মজা মায়ের দিকে অসহায় চোখে তাকায়। প্রান্ত এই বাড়িতে এসে প্রথম যা চাইল তাই পেল না। মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না তো! হেমলতা পদ্মজার দৃষ্টি বুঝেও কিছু বললেন না। প্রান্তকে ডেকে কোলে বসান। ছেলেটাকে দেখতে বেশ লাগছে। দুপুরে তিনি গোসল করিয়েছেন। মনে হয়েছে কোনো ময়লার স্তূপ পরিষ্কার করা হচ্ছে। জন্মদাতার মৃত্যু প্রান্তের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলল না। এজন্য কেউই অবাক হয়নি। বাপ-ছেলের শুধু রাতেই একসাথে থাকা হতো। অনেক রাত

প্রান্ত একা থেকেছে। এইটুকু ছেলে কত রাত ভয় নিয়ে কাটিয়েছে! হেমলতা আদুরে কণ্ঠে বললেন, 'একটা গল্প শোনাই। শুনবি?'
'হুনাও।'
পদ্মজা প্রান্তের ভাষার ভুল ধরিয়ে দিল, 'হুনাও না। বল, শোনাও আম্মা।'
প্রান্ত মাথা কাত করে। এরপর হেমলতাকে বলল, 'শোনাও আম্মা।'
আম্মা ডাকটা শুনে হেমলতা বুক বিশুদ্ধ ভাললাগায় ছেয়ে গেল। তিনি কণ্ঠে ভালবাসা ঢেলে বললেন, 'আমাদের একদিন মরতে হবে জানিস তো?'
'হ।'
'জান্নাত,জাহান্নামের কথা কখনো কেউ বলেছে?'

প্রান্ত মাথা দুই পাশে নাড়াল। কেউ শোনায়নি। হেমলতা এমনটা সন্দেহ করেছিলেন। প্রান্ত এ সম্পর্কে জানে না। তিনি ধৈর্য্য নিয়ে সুন্দর করে জান্নাত, জাহান্নামের বর্ণনা দিলেন। জান্নাতের বর্ণনা শুনে প্রান্তের চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করে উঠল। প্রশ্ন করল হাজারটা। হেমলতাকে জানায়, সে জান্নাতে যেতে চায়। জাহান্নামে যেতে চায় না। হেমলতা বললেন, 'আচ্ছা, এখন গল্পটা বলি। মন দিয়ে শুনবি।'

প্রান্ত মাথা কাত করে হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিল। হেমলতা বলতে শুরু করেন, 'একজন মহিলা একা থাকত বাড়িতে। না, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। খুব ছোট ছোট। খুব অভাব তাদের। ছোট একটা জায়গায় মাটির ঘর। ঘরের সামনে শখ করে একটা লাউ চারা লাগায়। লাউ গাছ বড় হয়। লাউ পাতা হয় অনেক। এই লাউ পাতা দিয়ে দিন চলে তার। কখনো সিদ্ধ করে খায়। নুন, মরিচ পেলে শাক রেঁধে খায়। তো একদিন একজন ভিক্ষুক মহিলা আসল। ভিক্ষুক মহিলাটি খায় না দুই দিন ধরে। লাউ গাছে লাউ পাতা দেখে খেতে ইচ্ছে করে। লাউ গাছের মালিক যে মহিলাটি,তাকে ভিক্ষুক বলে, লাউ পাতা দিতে। রেঁধে খাবে। খুব অনুনয় করে বলে। মহিলাটির মায়া হয়। ভিক্ষুক মহিলাকে কথা শোনাতে শোনাতে কয়েকটা লাউ পাতা ছিঁড়ে দেয়। তার কয়দিন পর লাউ গাছের মালিক যিনি, তিনি মারা গেলেন। গ্রামবাসী সহ মসজিদের ইমাম মিলে দাফন করেন। বুঝছিস তো প্রান্ত?'

'হ।'

প্রান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সে খুবই মনোযোগী শ্রোতা। হেমলতা বাকিটা শুরু করলেন, 'গ্রামের ইমাম একদিন স্বপ্ন দেখেন, যে মহিলাটিকে তিনি দাফন করেছেন তার চারপাশে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। কিন্তু তার গায়ে আঁচ অবধি লাগছে না। মহিলাটিকে ঘিরে রেখেছে লাউ পাতা। যার কারণে আগুন ছুঁতে পারছে না।

ওইযে তিনি একজন ভিক্ষুককে নিজের একবেলা খাবারের লাউ পাতা দান করেছিলেন। সেই লাউপাতা তাকে কবরের শাস্তি থেকে বাঁচাচ্ছে। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে আমাদের অনেক এবাদত করা উচিত। তার মধ্যে একটি হলো দান। সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা উচিত। কাউকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত না। বোঝা গেছে?'

'হ, বুঝছি। আমি দান করাম।'

'হুম। করবি। অনেক বড় হবি জীবনে। আর অনেক দান-খয়রাত করবি। আচ্ছা, প্রান্ত এখন যদি কোনো অভাবী এসে বলে, তোর লাউটা দিতে। তুই কী করবি?'
প্রান্ত গম্ভীর হয়ে ভাবে। এরপর বলল, 'দিয়া দিয়াম।'
'একটু আগে একজন মহিলা আসছিল না? দেখেছিস তো?'
'হ, দেখছি।'
' সে খুব গরীব। বাড়িতে বাচ্চা আছে ছোট। এসে বলল, লাউ দিতে। তাই তোর লাউটা দিয়ে দিয়েছি। এজন্য কী এখন তোর মন খারাপ হবে?'
'লাউডা তুমি দিছ। তাইলে তোমারে আগুন থাইকা বাঁচাইব লাউডা?'
'লাউটা আমি দিলেও, তোর জন্য ছিল। তুই এখন খুশি মনে মেনে নিলে লাউটা তোকে আগুন থেকে বাঁচাবে।'
হেমলতার কথায় প্রান্ত খুশি হয় খুব। পরপরই মুখ গম্ভীর করে প্রশ্ন করল, 'একটা লাউ কেমনে বাঁচাইব আমারে?'
প্রান্তর নিষ্পাপ কণ্ঠে প্রশ্নটা শুনে হেমলতা, পদ্মজা, পূর্ণা হেসে উঠল। পদ্মজা বলল, 'কয়টা পাতা অনেকগুলো হয়ে মহিলাটাকে বাঁচিয়েছিল। তেমন একটা লাউ অনেকগুলো হয়ে তোকে বাঁচাবে।'

প্রান্ত একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। হেমলতা হেসে হেসে তার উত্তর দিচ্ছেন। পদ্মজার হুট করেই প্রান্তের থেকে চোখ সরে হেমলতার উপর পড়ে। মা হাসলে সন্তানদের বুকে যে আনন্দের ঢেউ উঠে তা কী জানেন? পদ্মজার আদর্শ তার মা। সে তার মায়ের মতো হতে চায়।

পাঁচদিন শেষ। শুটিং দলের মধ্যে খুব ব্যস্ততা। সবকিছু গুছানো হচ্ছে। পাঁচ দিনে তাড়াহুড়ো করে শুট শেষ করা হয়েছে। লিখন উঠানে চেয়ার নিয়ে বসে আছে। চিত্রা এসে তার পাশে বসল। কাশির মতো শব্দ করল লিখনের মনোযোগ পেতে। লিখন তাকাল। ম্লানমুখে প্রশ্ন করল, ' সব গুছানো শেষ? '
'হুম, শেষ। তুমি তো কিছুই গুছাওনি।'

'বিকেলে রওনা দেব। আমার আর কি আছে গুছানোর? দুপুরেই শেষ করে ফেলব।'
'মন খারাপ?'

লিখন কিছু বলল না। লাহাড়ি ঘরের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে শূন্যতা। কিছু ফেলে যাওয়ার বেদনা। বুকের বাঁ পাশে চিনচিন করা ব্যাথা। চিত্রা হাত ঘড়ি পরতে পরতে বলল, 'ছোট বোনের সমান বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে ছিলে। এখন তার প্রেমেই পড়লে।'
লিখন কিছু বলল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। চিত্রা বলল, 'পদ্মজা কিন্তু অনেক বড়ই। আগামী মাসে ওর সতেরো হবে শুনেছি। এই গ্রামে সতেরো বছর বয়সী অবিবাহিত মেয়ে হাতেগোনা কয়টা। পদ্মজার শ্রেণীর বেশিরভাগ মেয়ে বিবাহিত। আর খুব কম মেয়ে পড়ে।'
চিত্রার কথা অগ্রাহ্য করে লিখন বলল, 'তোমার বিয়েটা কবে হচ্ছে?'
'বছরের শেষ দিকে। সব ঠিকঠাক থাকলে। আর ভগবান চাইলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ঢাকা রওনা দেবে। হেমলতা, মোর্শেদ বিদায় দিতে এসেছেন। দলটার তিন-চার জনের চরিত্রে সমস্যা থাকলেও বাকিরা খুব ভাল। হেমলতার সাথে মিশেছে খুব। নিজের বাড়ি মনে করে থেকেছে। বাড়ির দেখাশোনা করেছে। লিখন হেমলতার আড়ালে একটি সাহসিকতার কাজ করে ফেলল। ব্যস্ত পায়ে লাহাড়ি ঘরে আসল। বারান্দায় বসেছিল পদ্মজা। লিখনকে দেখে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। পদ্মজাকে কিছু বলতে দিল না লিখন। সে দ্রুত বারান্দায় উঠে পদ্মজার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে জায়গা ত্যাগ করল। পদ্মজা অনবরত কাঁপতে থাকে। পূর্ণা চৌকি থেকে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। সে হতভম্ব। ধীর পায়ে হেঁটে আসে। পদ্মজার সারা শরীর বেয়ে ঘাম ছুটছে। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে। হাত থেকে চিঠি পড়ে যায়। পূর্ণা কুড়িয়ে নিল। পদ্মজার গলা শুকিয়ে কাঠ।

হেমলতা এসে দেখেন পদ্মজা হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বসে আছে। কেমন দেখাচ্ছে যেন। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেব, ' পদ্ম? শরীর খারাপ?'

মায়ের কণ্ঠ শুনে পদ্মজা ভয় পেল। বাতাসে অস্বস্তি। নিঃশ্বাসে অস্বস্থি। চোখ দু'টি স্থির রাখা যাচ্ছে না। নিঃশ্বাস এলোমেলো। পূর্ণা পরিস্থিতি সামলাতে বলল, 'আম্মা, আপার মাথা ব্যথা।'

'হুট করে এমন মাথা ব্যথা উঠল কেন? পদ্মরে খুব ব্যথা?'

Kobitor.com

পদ্মজা অসহায় চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। আকস্মিক ঘটনায় সে ভেঙে পড়েছে। ডান হাত অনবরত কাঁপছে। হেমলতা তীক্ষ্ণ চোখে দু'মেয়েকে দেখেন। কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কি লুকোচ্ছিস দুজন? কেউ এসেছিল?'

মায়ের প্রশ্নে পদ্মজার চেয়ে পূর্ণা বেশি ভয় পেল। হাতের চিঠিটা আরো শক্ত করে চেপে ধরল। কি লিখা আছে না পড়ে, এই চিঠি হাতছাড়া করবে না সে।

চলবে....
®ইলমা বেহরোজ

আমি পদ্মজা - ১০

_____
হেমলতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীরের ফলার মতো পদ্মজার গায়ে বিঁধছে। সে কাঁপা স্বরে জানিয়ে দিল, 'শুটিং দলের একজন এসেছিল।'
হেমলতার ঠোঁট দুটো ক্ষেপে উঠল প্রচন্ড আক্রোশে। পদ্মজা সবাইকে চিনে না। তাই তিনি পূর্ণাকে প্রশ্ন করেন, 'পূর্ণা, কে এসেছিল?'
পূর্ণা দুই সেকেন্ড ভাবল। এরপর নতমুখে বলল, 'কালো দেখতে যে... মিলন।'

পদ্মজা আড়চোখে পূর্ণার দিকে তাকাল। তার ভয় হচ্ছে, মা যদি এখন বলে মিলন তো তার সামনেই ছিল। তখন কী হবে? পূর্ণা মিথ্যে বলল কেন! সত্য বললেই পারতো।
হেমলতা বিশ্বাস করেছেন নাকি করেননি দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল না। পূর্ণা মাথা নত করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইল। হেমলতা বারান্দা অবধি এসে আবার ঘুরে তাকালেন। মনটা খচখচ করছে। মনে হচ্ছে,ঘাপলা আছে। নাকি তার সন্দেহ মনের ভুল ভাবনা? কে জানে!

রাতে পদ্মজা খেতে চাইল না। বিকেলের ঘটে যাওয়া ঘটনা তাকে ঘোরে রেখেছে। চিঠিটা পড়তে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হচ্ছে না। তবুও কেমন, কেমন যেন অনুভূতি হচ্ছে। অচেনা,অজানা অনুভূতি। পদ্মজার হাব-ভাব হেমলতার বিচক্ষণ দৃষ্টির অগোচরে পড়ল না। তিনি ঠিকই খেয়াল করেছেন। কিন্তু মেয়েরা স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার থেকে কথা লুকোনোর ক্ষমতা নিয়ে যে জন্মায় তা তো অস্বীকার করা যায় না। যেমন তিনি এই ক্ষমতা ভাল করেই রপ্ত করতে পেরেছেন। পদ্মজাকে জোর করে খাইয়ে দিলেন। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না।

রাতের মধ্যভাগে মোর্শেদ হেমলতাকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে হেমলতা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলেন। চাপা স্বরে ক্রোধ নিয়ে বললেন, 'তোমার বাসন্তীর কী হয়েছে? সে কী তোমাকে ত্যাগ করেছে? সেদিন ফিরে এলে কেন?'

মোর্শেদ চমকালেন, অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন। হেমলতা বাসন্তীকে চিনল কী করে? এই নাম তার গোপন অধ্যায়। অবশ্য হেমলতা মতো মহিলা না জানলেই বোধহয় বেমানান লাগতো। মোর্শেদ বিব্রত কণ্ঠে বললেন,
'হে আমারে কী ত্যাগ করব। আমি হেরে ছাইড়া দিছি।'

হেমলতা বাঁকা হাসলেন। অন্ধকারে তা নজরে এলো না মোর্শেদের।
'বিশ বছরের সংসার এমন আচমকা ভেঙ্গে গেল যে!'

হেমলতার কণ্ঠে ঠাট্টা স্পষ্ট। চাপা দীর্ঘশ্বাসটা গোপনে রয়ে গেল। মোর্শেদের শরীরের পশম দাঁড়িয়ে গেল। এ খবরও হেমলতা জানে? এতকিছু কী করে? হেমলতার চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল। তিনি চাদর গায়ে দিয়ে চলে যান বারান্দায়। রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে। মোর্শেদের কোনো কৈফিয়ত তিনি শুনতে চান না। তাই বারান্দার রুমে এসে বসেন। কতদিন পর রাতের আঁধারে বারান্দার রুমে তিনি। বিয়ের এক বছর পরই জানতে পারেন, মোর্শেদ তাকে বিয়ে করার ছয় মাস আগে বাসন্তী নামে এক অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে। স্বামীর ঘর ছাড়া আর পথ ছিল না বলে, এতো বড় সত্য হজম করে নিতে হয়।

বাসন্তীর মা বারনারী। আর একজন বারনারীর মেয়েকে সমাজ কিছুতেই মানবে না। মোর্শেদের বাবা মিয়াফর মোড়ল টাকার বিনিময়ে দেহ বিলিয়ে দেওয়া একজন বারনারীর মেয়েকে ছেলের বউ হিসেবে মানতে আপত্তি করেন। ততদিনে মোর্শেদ বিয়ে করে নিয়েছে। সে খবর মিয়াফর মোড়ল পেলেন না। তিনি মোর্শেদের মন ফেরাতে শিক্ষিত এবং ঠান্ডা স্বভাবের হেমলতাকে বেছে নিলেন। কুরবান হলো হেমলতার! তখন কলেজে উঠার সাত মাস চলছিল! এরপর পড়াটাও আর এগুলো না। জীবনের মোড় করুণরুপে পাল্টে গেল।

পরদিন সকাল সকাল স্কুলে রওনা হলো তারা। পূর্ণা পথে চিঠিটা পড়ার পরিকল্পনা করেছিল। পদ্মজা হতে দিল না। সেয়ানা দুইটা মেয়ের হাতে কেউ চিঠি দেখে ফেললে? ইজ্জত যাবে। পূর্ণা পদ্মজার প্রতি বিরক্তবোধ করল। চিঠিটা তার কাছে। পথে নতুন করে পরিকল্পনা করল সে ক্লাসে বইয়ের চিপায় রেখে চিঠি পড়বে। তাও

হলো না। পর পর দুই দিন কেটে গেল। সুযোগ পেলেও পদ্মজা পড়তে দিতে চাইতো না। সারাক্ষণ হাতে জান নিয়ে যেন থাকে। এই বুঝি মা এলো! দুই দিন পর মোক্ষম সুযোগ পেল। হেমলতা বাপের বাড়ি গিয়েছেন। প্রান্ত এবং প্রেমাকে নিয়ে। যদিও কয়েক মিনিটের পথ। দ্রুতই ফিরবেন। পদ্মজার চেয়ে পূর্ণার আগ্রহ বেশি। সে চিঠি খোলার অপেক্ষায় ছিল। আজ খুলতে গিয়ে মনে হলো, যার চিঠি তার খোলা উচিত এবং আগে তার পড়া উচিত। তাই পদ্মজার দিকে চিঠি বাড়িয়ে দিল। পদ্মজা চিঠি খুলতে দেরি করছিল বলে পূর্ণা তাড়া দিল, 'এই আপা, খোল না। লজ্জা পাচ্ছো কেন? চিঠি এটা। কারো গায়ের কাপড় খুলতে বলছি না।'

পদ্মজা চমকে তাকাল। যেন পূর্ণা কাউকে খুন করার কথা বলেছে। পদ্মজা বলল, 'কিসব কথা পূর্ণা।'

'আচ্ছা, মাফ চাই। আর বলব না। '

পদ্মজা ভাঁজ করা সাদা কাগজটা মেলে ধরল চোখের সামনে। প্রথমেই বড় করে লেখা ' প্রিয় পদ্ম ফুল'।
পূর্ণা পাশে এসে বসল। দুজনের মনোযোগ চিঠিতে।

প্রিয় পদ্ম ফুল,

আমি ভেবে উঠতে পারছি না কীভাবে কী বলব। আজ চলে যাব ভাবতেই বুকে তোলপাড় চলছে। তার কারণ তুমি। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, থমকে গিয়েছিল নিঃশ্বাস,কণ্ঠনালী। এতটুকুও মিথ্যে বলিনি। সেদিন
শুটিংয়ে সংলাপ বলতে গিয়ে ভুল করেছি বার বার। না চাইতেও বার বার চোখ ছুটে যাচ্ছিল লাহাড়ি ঘরের দিকে। বুকে থাকা হৃদপিণ্ডটায় শিরশিরে অনুভূতি শুরু হয় সেই প্রথম দেখা থেকেই। প্রতিটা ক্ষণ গুণেছি তোমাকে দ্বিতীয় বার দেখার আশায়। দ্বিতীয় বার দেখা পাই যখন বেগুন নিতে আসো। সেদিন কথা বলার লোভ সামলাতে পারিনি। টমেটোর অজুহাতে শ্রবণ করি পদ্ম ফুলের কণ্ঠ। মনে হচ্ছিল, এমন রিনরিনে গলার স্বর আর শুনিনি। রাতের ঘুম আড়ি করে বসে। তোমায় প্রতিনিয়ত দেখার একমাত্র পন্থা তোমার স্কুল। সবার অগোচরে কতবার তোমার পিছু নিয়েছি। তুমি বোকা, ধরতে পারোনি একবারও। সুন্দরীরা বোকা হয় আবার প্রমাণ হলো। এই রাগ করবে না, বোকা বলেছি বলে।

জানতে পারি, তোমার মায়ের ইচ্ছে তুমি অনেক পড়বে। অনেক উঁচু বংশ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেখানে আমি অতি সামান্য।

তবুও সাহস করে তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেই। পদ্ম ফুলটাকে যে আমার চাই। তিনি রাজি হননি।নায়কের সাথে আত্মীয়তা করবেন না। আর বললেন, তোমার অনেক পড়া বাকি। তোমার মা কিছুতেই রাজি হবেন না। আহত মনে দু পা পিছিয়ে আসি। ভেবেছি, তোমার কলেজ পড়া শেষ হলে পরিবার নিয়ে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসব। তোমার মা সম্পর্কে যা জেনেছি, বুঝেছি তাতে এতটুকু বিশ্বাস আছে, তিনি নায়ক বলে আমাকে এড়াবেন না। তিনি বিচক্ষণ মস্তিষ্কের মানুষ।

আমি তোমায় ভালবাসি পদ্ম ফুল।

ইতি
লিখন শাহ্

পদ্মজার মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। পূর্ণা হাসছে। ভ্রু উঁচিয়ে পদ্মজাকে বলল, 'আপারে, লিখন ভাইয়ার সাথে তোমাকে যা মানাবে! কী সুন্দর করে লিখেছে।'

পদ্মজা লজ্জায় চোখ তুলতে পারছে না। পূর্ণা বলল, 'একদম বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ! আপা তুমি কিন্তু বিয়ে করলে লিখন ভাইয়াকেই করবে।'
'আর কিছু বলিস না।'
পদ্মজা মিনমিনে গলায় বলল। পূর্ণা শুনল না। সে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে, ' আমার ভাবতেই কী যে খুশি লাগছে আপা। নায়ক লিখন শাহ আমার বোনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। একদিন বিয়ে হবে।'
'চুপ কর না।'
'এই আপা, লিখন ভাইয়াকে ফেরত চিঠি দিবে না?'
পদ্মজা চোখ বড় করে তাকাল। অবাকস্বরে বলল, 'কীভাবে? ঠিকানা কই পাব? আর আম্মা জানলে? না, না।'

পূর্ণা আর কিছু বলতে পারল না। হেমলতার উপস্থিতি টের পেয়ে চুপ হয়ে গেল। পদ্মজা দ্রুত চিঠিটা ভাঁজ করে বালিশের তলায় রাখল। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে।

চলবে...
®ইলমা বেহরোজ

Kobitor.com

Kobitor.com